উৎস মানুষ

৩২ বর্ষ • ২য় সংখ্যা • এপ্রিল-জুন ২০১২

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		
বাংলা-প্রেমের বিড়ম্বনা	অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	২
প্রযুক্তি ও বদলে-যাওয়া মোবাইল ফোন	ভূপতি চক্রবর্তী	৪
গাছকাটার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ	পূরবী ঘোষ	৭
জলাভূমি বাঁচাতে কেউ কেউ জেগে থাকে	অরুণ পাল	৮
বনবিহারী ও বনফুল	সমীরকুমার ঘোষ	১০
সমুদ্র উপকূলের স্রোত	গৌতমকুমার সেন ও শরণ্যা চক্রবর্তী	১৫
আমাদের বায়ুমণ্ডল ও আবহাওয়া চর্চা	অঞ্জনকুমার সেনশর্মা	১৮
জলবায়ুর ওপর সমুদ্রস্রোতের প্রভাব	বিবেক সেন	২১
আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণ একটি রূপরেখা	সমীরকুমার ব্যানার্জী	২৬
স জনাস ইন্দ্রঃ	অজানা চৌধুরী	৩০
আবহাওয়ার পূর্বাভাস	গোকুল চন্দ্র দেবনাথ	৩৬

রেজিস্টার্ড অফিস - বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক,কলকাতা-৬৪

কার্যালয়
খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন
বি ৪ ও ৫, এস-৩, নারায়ণপুর
পোঃ (আর) গোপালপুর কলকাতা-৭০০১৩৬
ফোন:
৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬
ওয়েবসাইট : www.utsamanush.com
ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com

আমাদের কথা

নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও আমরা বইমেলায় অংশ নিয়ে চলেছি। শুধু বই বিক্রি নয়, এর বড় উদ্দেশ্য সরাসরি পাঠক-শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ। মাঝে কয়েক বছর প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়ায় আমরা গ্রাহক করা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু পাঠকের চাপে পড়েই শুরু হয়েছে সেই কাজ।

নতুন বই নেই, এই অভিযোগ এবারও শুনতে হল। আসলে পুরনো বইগুলোর চাহিদা এখনও এত প্রবল যে দু-একটা করে সেগুলো না ছাপালেই নয়। এবারও তাই বহুদিন আগে শেষ হয়ে যাওয়া 'শেকলভাঙা সংস্কৃতি' আর 'প্রমিথিউসের পথে' ছাপা হল। ইতিমধ্যে 'বিবেকানন্দ অন্য চোখে'ও শেষের পথে। পুরনো বইগুলোর জোগান অব্যাহত রাখব, না নতুন বই ছাপব— এই টানাপড়েনে পুরনো বইয়েরই জয় হচ্ছে। তবে সামনের বইমেলায় অন্তত একখানা নতুন বই যাতে পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া যায়, তার জন্য কোমরবেঁধে নেমেছি।

আগে আমরা 'বন্যা' ও 'যৌনদাসী' সংখ্যা করেছি। এবার বিশেষ ক্রোড়পত্র হিসাবে থাকছে 'আবহাওয়া'। প্রবীণ আবহাওয়া বিজ্ঞানী অঞ্জন সেনশর্মা এই কাজটুকুর জন্য প্রাণপাত করেছেন। লেখা জোগাড় থেকে সম্পাদনা— নানা হ্যাপা তাঁকেই পোহাতে হয়েছে। প্রচণ্ড উৎসাহ দিয়ে গিয়েছেন অজানাদি, অজানা চৌধুরি। উৎস মানুষ পত্রিকাকে এঁরা নিজেদের পত্রিকাই মনে করেন। বিশ্বাস করেন, এই জাতীয় পত্রিকার গুরুত্ব ও ভূমিকা এখনও আছে। এমন সুহৃদদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর লৌকিকতা করা ধৃষ্টতারই নামান্তর।

গত ১৪ মার্চ প্রয়াত হয়েছেন হিমানীশ গোস্বামী। ওঁর সঙ্গে আমাদের অনেক দিনের আত্মীয়তা। ওঁর লেখা 'বাংলা বন্ধ' প্রকাশ করেছিল উৎস মানুষ। শুধু লেখা নয়, বিভিন্ন সময়ে উপদেশ-পরামর্শ দিয়ে উনি আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। ওঁর মৃত্যুতে একজন শুভানুধ্যায়ীকে হারালাম। এমন দুঃসংবাদের পাশাপাশি এক সুসংবাদও আছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবার বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদক পেয়েছেন। নিজেদের লোকের এই সম্মানপ্রাপ্তিতে আমরাও গর্বিত, আনন্দিত।

আহরণ

বাংলা-প্রেমের বিড়ম্বনা

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

সেটা জুলাই ২০০৫, পত্রিকা প্রকাশ বন্ধই। সেই সময় উৎস মানুষের ইন্টারনেট সংস্করণে এই লেখাটি লিখেছিলেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্নদাশঙ্কর রায় এক মোক্ষম প্রশ্ন তুলেছিলেন: তেলের শিশি ভাঙলো বলে খুকুর পরে রাগ করো/তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা বাংলা ভেঙে ভাগ করো, তার বেলা? ... যাদের এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কথা, সেই 'ধেড়ে খোকা'রা আজও উত্তর দেয় নি, দিতে পারে নি।

আরেক খুকুর মা কাকলিও পারে নি। খুকু যখন প্রশ্ন করেছিলো —মা, জানো তো, শুভ ওর মাকে মামি বলে। মেঘলা বলেছে শুভর মামি-ই নাকি ওর মা। তাই কি হয় মা কখনো? কাকলি উত্তর দেয় নি, উল্টে প্রচণ্ড বকা দিয়েছে—ফের যদি এসব বাজে কথা বলবে তো চড় খাবে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে খুকু, কী যে দোষ করল বুঝতেই পারে নি।

রাগ। রাগে মেয়েকে বকেছিল কাকলি। মা'কে মাম্মি, বাবাকে ড্যাডি, শুনলেই মাথা গরম হয়ে যায় ওর। যদিও মনে মনে কষ্টও হচ্ছিল, বেচারি খুকুটার নরম মনে আঘাত দিল। আসলে কাকলির রাগটা অন্যত্র। তার নিজের গভীর বাংলা প্রীতি আর প্রতিবেশীদের আচার-আচরণ—এ দু'য়ের দ্বন্দ্ব নিয়ে বেজায় বিপাকে পড়ে আছে সে। বলতেও পারে না কাউকে মন খুলে, রাগের সেটাও আরেকটা কারণ।

সকাল বেলায় একটু বারান্দায় আল্‌তো রোদে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙারও জো নেই। মুখোমুখি বাঁ দিকের ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে মূর্তিমান হাজরাবাবু হাজির। হাফ প্যান্ট। লোমশ পা। মুখভর্তি পেস্টের ফেনা নিয়ে তার মধ্যেই দন্তপাটি বের করে গদগদ গলায় বলেন—গুড মর্নিং ম্যাডাম। কষ্ট করে কৃত্রিম হাসি দিয়ে ভদ্রতা দেখায় কাকলি—সুপ্রভাত। বলে একটু পরেই ভেতরে চলে আসে। যত্ত সব! নতুন এসেছে হাজরা পরিবার। এর মধ্যেই বেশ কয়েকদিন, বলতে গেলে প্রায় রোজই, ওই একই 'কন্দর্প'কান্তির মুখ থেকে ইংরিজিতে প্রভাত সম্ভাষণ শুনতে হয়েছে কাকলিকে; বিনিময়ে প্রতিবার বাংলা 'সুপ্রভাত' জানিয়েছে সে। হাজরাবাবু তাতে খুশি হন নি। প্রথমে হাসি বন্ধ হয়েছে, তারপর গম্ভীর গোঁসা মুখ। ... এবার সমস্যা হল খুকুকে নিয়ে। হাজরার মেয়ে টুম্পা খুকুর খেলার প্রিয় সাথ, কিন্তু ওদের দু'জনের খেলা বন্ধ করে দিয়েছে টুম্পার বাবা। 'সুপ্রভাত' আর 'গুড মর্নিং'-এর জাঁতাকলে পড়ে বন্ধু হারালো বেচারি খুকু। কাকলির মায়া হয়, প্রিয় সাথী হারিয়ে বিমর্ষ খুকু ঘুরঘুর করে সারা বিকেল, বড় কষ্ট লাগে। কিন্তু কী-ই বা করার আছে!

পাশের ব্লকে সেনগুপ্তদের একটা ছোট মেয়ে আছে, খুকুরই বয়সী। আলাপ হয় নি, মনে হয় ফ্যামিলিটা ভালোই। সেনগুপ্তবাবু বাংলার অধ্যাপক, ধুতি পরেন। স্ত্রী ডাক্তার। একটু ডাঁট আছে ঠিকই কিন্তু রাস্তায় দেখা হলে হাসেন, ঘরে আসতে বলেন। সেদিন সন্ধ্যেবেলা চলেই গেল কাকলি মেয়েকে নিয়ে। সাদর আপ্যায়ন হল। বসার ঘর ভর্তি বই, বেশির ভাগই বাংলা, বেশ কিছু লিট্‌ল ম্যাগাজিন গুছিয়ে রাখা। কাকলি তৃপ্তির শ্বাস ছাড়ে। একটু পরেই 'আন্টি, আন্টি' বলে ছুটে আসে ওদের ছোট্ট মেয়েটা। প্রাণবন্ত খুব। চোখে মুখে কথা বেরোচ্ছে যেন; বেশ লাগে প্রথম নজরেই।

—কী নাম তোমার?

—মাই নেম ইজ পামেলা সেনগুপ্তা।

একটু ধাক্কা লাগে কাকলির। ... যাক গে।

—খুব বই পড় নিশ্চয়ই, কী বই বেশি ভালো লাগে তোমার? কাকলি আলাপ ঘন করার চেষ্টা করে, গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে খুকু।

—এ বইগুলো তো সব ড্যাডির। মাম্মি তো সময়ই পায় না পড়ার, আমার কমিক্‌স খুব ফেভারিট। আবোল-তাবোলের পোয়েম্‌সগুলো আমার মুখস্থ, বলব আন্টি?

—অ্যাঁ? ...হ্যাঁ হ্যাঁ, বল না, খুকুও বলবে তারপর।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল কাকলি, মনটা ছিটকে যাচ্ছে। বাংলার অধ্যাপকের মেয়ে ...! সামনের সোফায় বসা পামেলার মা কিছু আঁচ করলেন কিনা কে জানে। খানিকটা অযাচিত কৈফিয়তের ভঙ্গীতে বললেন —মেয়েটার গল্প কবিতার বইয়ের ওপর খুব ঝোঁক, জানেন! মুশকিল হল বাংলাটা খুব ভালো শেখে নি, স্কুলে বাংলা বেশি শেখায় না তো! তবে ইংলিশে ওকে কেউ হারাতে পারে না, নিজেদের মেয়ে বলে বলছি না।

কাকলির বন্ধু-সন্ধান শেষ হয়ে গেছে এর মধ্যেই। খুকু বন্ধু খুঁজে নিয়েছে ঠিক। কিন্তু কাকলির সেই রাগ, মাইগ্রেনের মতো মাথায় দপ্‌দপ্ করে। এত অধঃপাতে গিয়েও বাঙালির এত দেমাক

কেন সে বোঝে না। অসহ্য! কিন্তু কোথায়ই বা পালিয়ে যাবে, বুঝতে পারে না।

কাকলির বর দেবব্রত। কট্টর বঙ্গপ্রেমী। ফোন নম্বর সবসময় বাংলায় বলে, অফিস নোট বাংলায় লেখে, কখনো 'দূরভাষ' ছাড়া 'ফোন' বলে না। গুড মর্নিং, ওকে, থ্যাঙ্কিউ, সরি এসব নিত্য-ব্যবহার্য উপকরণ দেবব্রত সযত্নে পরিহার করে। কষ্ট করে আয়ত্ত করতে হয়েছে তাকে মাতৃভাষা ব্যবহারের প্রতি একনিষ্ঠ সততা। এরকম প্রসংসনীয় নিষ্ঠা বাঙালিদের মধ্যে প্রায় দেখাই যায় না।

তবু এহেন একজন বাংলাপ্রেমীকে প্রায়শই খোঁচা খেতে হয় সহকর্মীদের কাছে। এই তো সেদিন তার অফিসের পি আর ও নিরীহ মুখ করে বললেন—দেবুবাবু, আপনার তো ফোন নাম্বার খুব মনে থাকে; আমাদের দিল্লী ব্রাঞ্চ অফিসের ফোন নাম্বারটা মনে আছে?

—হ্যাঁ আছে। লিখুন, শূন্য এক এক, ছয় তিন চার ...

হাঁ হাঁ করে মাঝ পথে থামিয়ে দেন পি আর ও;—দাঁড়ান দাঁড়ান। ওই শূন্য এক এক, মানে জিরো ওয়ান ওয়ান, তাই বললেন তো! এটা কিসের নাম্বার মশাই?

—কেন, দিল্লীর এস টি ডি কোড নম্বর!

—ওই দেখুন দেবুবাবু, সব সময় বাংলা বাংলা বলে ভাষণ দিচ্ছেন, বাংলা ইউজ করছেন সাত্ত্বিক বামুনের মতো, তাহলে 'এস টি ডি' বলছেন কেন? বাংলায় বলুন!

খ্যাক খ্যাক করে দু'একজন এপাশ ওপাশ থেকে হেসে ওঠে। দেবব্রত চুপ করে যায়। এটা যে সচেতনভাবে ওকে বিদ্রূপ করার জন্যই সাজানো হয়েছে, এখন বুঝতে পারে; মনের ব্যথা মনেই রেখে দেয়। এ ধরনের ব্যাপার প্রায়ই ঘটে অফিসে। বাংলাকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসার দোষে ক্রমশ যেন একলা হয়ে যাচ্ছে যে সে। কিন্তু গোলমালটা কোথায়, দোষটা কিসের, বুঝতে পারে না।

ছেলেবেলায় বুলগানিন ক্রুশ্চেভ-এর কলকাতা সফর মনে আছে তার; সর্বত্র সঙ্গে সঙ্গে দোভাষী ঘুরছে। ভাষণ, বিবৃতি, সাক্ষাৎকার, কথোপকথন, সব তাঁদের রুশ ভাষায়, দোভাষী ইংরিজিতে অনুবাদ করে দিচ্ছে। এখনো রাশিয়া, চীন, স্লাভ দেশ, বা কিউবার জনপ্রতিনিধিরা বিদেশে গেলে তাদের মাতৃভাষাতেই কথা বলেন, প্রয়োজনে দোভাষীর সাহায্য নেন। এইসব উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রীয় নেতারা, আমলারা কিংবা ওদের বুদ্ধিজীবীরা ইংরিজি জানেন না—এমন ভাবলে মূর্খামি হবে; তাঁরা ইংরিজি বিলক্ষণ জানেন কিন্তু কথা বলেন মাতৃভাষায়, পরিপূর্ণ গর্বের সঙ্গে।

আর আমাদের দেশে? এই বঙ্গভূমিতে? বাংলা ভালো না-জানা আর কথায় কথায় ইংরিজি শব্দ বাক্যাংশ ব্যবহার করাটা যেন গর্বের ব্যাপার। সভা-সমিতি-সেমিনার-আলোচনাচক্রে দেখা যায়, হলভর্তি শতকরা পঁচানব্বই ভাগ শ্রোতা বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও মঞ্চস্থ বক্তা বুক ফুলিয়ে ইংরিজিতে বলে যাচ্ছেন, বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তির গবেষণাপত্রে পেশ করা অবশ্য অন্য কথা। এর মধ্যে কদাচিৎ দু'একজন ব্যক্তিত্ববান সাহসী বক্তা বাংলায় বললে অনেক বাঙালি দর্শকই মনে মনে বক্তার কৃতিত্বকে খাটো চোখে দেখে। যেন ইংরিজিতে বলতে না-পারার অক্ষমতাই 'আসলে' বাংলা বলার কারণ।

এই ''আত্মঘাতী বাঙালি'' শিক্ষিতকুল এখন সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ। অথচ এই সমাজেই আদর্শনিষ্ঠ বাংলা প্রেমীদের থাকতে হবে, চলতে ফিরতে হবে, কথা বলতে হবে, কথা শুনতে হবে। নিজেদের জেদটাকে ধরে রাখতে হলে, বাংলাকে যোগ্য মর্যাদার জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখতে হলে, রাগ দুঃখ বিরক্তিতে সরে গিয়ে লাভ নেই। এই সমাজে সহনশীলতার পদ্ধতি নির্বাচন করে নিতে হবে নিজেদেরই। আর, কাকলি-দেবব্রতদের এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, বাংলাভাষাকে ভালোবাসা মানে কিন্তু ইংরিজির প্রতি বিদ্বেষ নয়; যেমন নারীমুক্তি মানে পুরুষ-বিদ্বেষ নয়। এটা মাথায় রাখা জরুরি।

উমা

বিধিসম্মত ঘোষণা

প্রকাশক	:	বরুণ ভট্টাচার্য (সা.)
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	বি ডি ৪৯৪, সল্ট লেক, কলকাতা ৭০০০৬৪
প্রকাশস্থান	:	ঐ
স্বত্বাধিকারী	:	সচিব, 'উৎস মানুষ' সমিতি (বরুণ ভট্টাচার্য)
ঠিকানা	:	বি ডি ৪৯৪, সল্ট লেক, কলকাতা ৭০০০৬৪
মুদ্রক	:	বরুণ ভট্টাচার্য
মুদ্রণস্থান	:	শান্তি মুদ্রণ ৩২/৩, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯
সম্পাদক	:	সমীরকুমার ঘোষ (সা.)
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	ঐ

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরিউক্ত তথ্যগুলি আমার বিশ্বাস ও জ্ঞানানুসারে সত্য।

স্বাঃ বরুণ ভট্টাচার্য
প্রকাশক

প্রযুক্তি ও বদলে-যাওয়া মোবাইল ফোন

ভূপতি চক্রবর্তী

একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী দিয়ে শুরু করা যাক। গাড়োয়ালের পাহাড়ে ছোট্ট একটা পদযাত্রা করছি। সময় ২০১১-র অক্টোবর। মোটামুটি দু'ঘণ্টার চড়াই ভাঙলে পৌঁছে যাওয়া যাবে এক ছোট সরোবরে পরিভাষায় যাকে বলে 'তাল'। বেশ বড়সড় এক পাহাড়ি গ্রামের মাথার ওপরকার পাহাড়চূড়ার উদ্দেশ্যে এই যাত্রায় আমার মত আরও কিছু মানুষ রয়েছেন। আর, একই পথে চলেছেন ঐ গ্রামের কিছু মহিলা। নানা বয়সের ঐ মহিলারা হাতে ছোট দা বা কাটারি নিয়ে চলেছেন ঐ পাহাড়চূড়ার রাস্তায়, একটু পরেই আবিষ্কার করলাম তাদের গন্তব্য ঐ 'তাল' নয়, তারা চলেছেন জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে। না, গ্রামের লাগোয়া গাছে তারা হাত দিচ্ছেন না, ওপরের দিকের উঁচু কিছু গাছের শুকনো ডালপালাই তাদের লক্ষ্য। দেখলাম ওরকম জ্বালানি কাঠকুটার বিশাল এক বোঝা পিঠে—মাথায় তুলে নিচের দিকে নামার উদ্যোগ নিচ্ছেন এক মাঝবয়সী মহিলা। বিবেচনার সঙ্গে এই জ্বালানি নির্বাচন ও সংগ্রহের জন্য পরিবেশ রক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে এই মহিলারা অবশ্যই সাধুবাদের যোগ্য। আর তখনই একটু অবাক করে দিয়ে বেজে উঠল পুরোনো এক জনপ্রিয় হিন্দী গানের সুর, 'গোরি তেরা গাঁও বড়া পেয়ারা...।' মাথার বোঝা নামিয়ে হাসিমুখে মোবাইল ফোনের আওয়াজে সাড়া দিলেন গ্রামবাসী মহিলা—শুরু হল তার কথোপকথন। তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন কারণ আমাদের বিস্ময় তার নজর এড়ায় নি। আমরা নিজেদের মোবাইল ফোন বার করে দেখলাম সেখানে 'টাওয়ার' অর্থাৎ পরিষেবার লভ্যতা সত্যিই রয়েছে। আর এটা আমরা ঠিক আশা করি নি।

যদি যথাযথ সংখ্যাতত্ত্বের উল্লেখ ছাড়াও বলা হয় যে ভারতবর্ষে যত মানুষ শৌচালয় (স্যানিটারি) ব্যবহার করেন তার তুলনায় ঢের বেশি মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন তা হলে বোধহয় কেউ আপত্তি করবেন না। মোবাইল কার হাতে নেই! বহু মোবাইল ফোনে ভরা আছে দুটি সিম কার্ড অর্থাৎ যেন জোড়া ফোন। আক্ষরিক অর্থেই প্রযুক্তি হাতের মুঠোয়। আর কেবলই কি ফোন? আদতে হাতের মুঠোয় তো এসে গেছে এক আজব যন্ত্র। কত কিছুই না তার সাহায্যে করা যায়! কিংবা বলা যায় সেরকম মোবাইল ফোন বা হ্যান্ডসেট হাতে থাকলে কি না করা যায়! আর এই করা না করার সীমারেখাটা নিয়েই দেখা দিয়েছে কিছু নতুন সমস্যা—সামাজিক বা ব্যক্তিগত জীবনে।

কোনো প্রযুক্তি ঠিক কোন সময়ে উদ্ভাবিত হবে তা কিছুটা হয়ত আঁচ করা যায় বিশেষ করে যে প্রযুক্তি ধারাবাহিক ভাবে কতগুলি স্তর অতিক্রম করে চলে। তবু সর্বদাই যে প্রত্যাশা মিলে যায় এমন নয়, তবে কিছুটা অনুমান করা যায়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দুটি বিষয়ে আগাম আন্দাজ পাওয়া সচরাচর শক্ত হয়ে থাকে, যদিও দুটির গুরুত্ব খুবই বেশি। প্রথমত একটি প্রযুক্তি কোনো দেশ বা সমাজে যখন প্রবেশ করে তখন দেশটির সামাজিক কাঠামোটি ঠিক কোন অবস্থায় রয়েছে তার ওপর অনেকটাই নির্ভর করে প্রযুক্তির প্রভাব সেখানে কীরকম হবে। দ্বিতীয়ত যে সমাজ বা দেশে প্রযুক্তিটি প্রবেশ লাভ করে বা করতে চায় সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থাটা ঠিক কোন পর্যায়ে রয়েছে তার ওপরেও নির্ভর করে প্রযুক্তিটি সমাজকে কীভাবে প্রভাবিত বা পরিবর্তিত করবে। এবার এই দুটি বিষয় মোবাইল ফোন ও তার ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা ও বিস্তার করার চেষ্টা করব, অবশ্যই আমাদের দেশ ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে।

আমাদের দেশে মোবাইল ফোন এবং তার পরিষেবার আগমন মাত্র বছর দশ বারো আগে। আন্তর্জাতিক বিচারে হয়ত আমরা তেমন পিছিয়ে শুরু করিনি কারণ যুগটা বিশ্বায়নের। তবে বলা দরকার যে আমাদের যখন প্রথম মোবাইল ফোনের সঙ্গে পরিচিতি ঘটতে শুরু করে তখন তা ছিল এক অতি মহার্ঘ বস্তু। বেশ বড় সাইজের হ্যান্ডসেট, তার ভারি চেহারা আর ছোট্ট স্ক্রিন নিয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করত। গোড়াতে কল নিয়মিত করলেও গ্রাহককে পয়সা দিতে হত। তার পাল্লা ছিল সীমিত আর ঐ পরিষেবার

গ্রাহক সংখ্যা ছিল আরও সীমিত। তার পরের পাঁচ-ছ বছরে কি হয়েছে আমরা সকলেই জানি। আর তারও বছর দুয়েকের মধ্যে মোবাইল ফোন যথার্থই জনগণের প্রযুক্তি হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বড় কথা এই ফোন ব্যবহার জনিত ব্যয় এমন জায়গায় নেমে এসেছে তা প্রায় ভাবাই যায় না। খুব সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার মানুষ বা নিছকই দরিদ্র মানুষ যাদের হয়ত বছর তিনেক আগেও জিজ্ঞাসা করা যেত না যে প্রয়োজনে তার সঙ্গে যোগাযোগের উপায় কি; আজও কিন্তু তারা না চাইতেই বলছেন আমার ফোন নম্বরটা রেখে দিন, যে দিন কাজটা করাবেন তার আগের দিন ফোন করে দেবেন। এই 'কাজটা' হতে পারে বাড়ির জঙ্গল সাফ, ইলেকট্রিক বা জলের লাইনের কাজ কিংবা ভ্যান রিকশায় বাড়ির ছোট আলমারিকে মেরামত ও রং করতে নিয়ে যাওয়া। 'কনট্যাক্ট নাম্বার' এখন প্রায় সকলেরই নিজস্ব। এখন আর পাশের বাড়ির ফোন নম্বর দিতে হয় না প্রতিবেশীকে। বলতে হয় না ফোন এলে ডেকে দেওয়ার কথা।

ভারতবর্ষে বাণিজ্যিক বিমান পরিষেবা পঁচাত্তর বছরের আগে শুরু হলেও কিন্তু তা এরকম সর্বশ্রেণীর কাছে পৌঁছতে পারে নি নিছকই অর্থনৈতিক কারণে। কমপিউটার কিন্তু এ ব্যাপারে কেবল বহু এগিয়েই নয় তা রীতিমত পথিকৃৎ। তবে তার অগ্রগতির হারও মোবাইল ফোনের তুলনায় ধীর। অথচ তুলনায় অনেক পুরোনো প্রযুক্তি হিসেবে পরিচিত পুরোনো টেলিফোন অর্থাৎ আজকের পরিভাষায় ল্যান্ড লাইনের প্রসারও কিন্তু সেই মাত্রায় ঘটে নি। বরং প্রসার লাভ করেছে এসটিডি, আইএস ডি বুথ। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর নিরিখে বিচার করলে ভারতবর্ষে সাক্ষর মানুষের সংখ্যা অতটা কম মনে হবে না। অর্থাৎ যদি ধরে নিই যিনি মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারছেন তিনি আর যাই হোন নিরক্ষর নন তাহলে বোধহয় আমরা মোবাইল ফোনের সাহায্যে খানিকটা সাক্ষরতার প্রসার ঘটিয়ে ফেলেছি বলা যাবে।

কথাটা অবশ্য ঠিক নয়—কারণ এখানেও প্রযুক্তি বাজিমাত করেছে। ফোনে কেবল নাম 'লিখে' নম্বর জমা রাখতে হচ্ছে না—ফোনের গ্রাহকের ছবি দিয়েও তা 'সেভ' করা যাচ্ছে। ফলে বাড়ির কাজের মহিলাটির ফোন এলে তিনি ফোন তুলেই দেখছেন তার ছোট ছেলে কিংবা বড় মেয়ের ছবি আর বুঝে যাচ্ছেন ফোনটি কে করেছে। আর এইসব কারণেই মোবাইল ফোনের কাছে আরও চাহিদা বাড়ছে। ব্যবহারকারী হিসেবে আমরা চাইছি ফোনের মধ্যেই ঢুকে বসে থাক আরও বেশি সুবিধা। জমা থাক আরও বেশি ছবি ও গান। যে কোনো জায়গাতেই মিলুক তার এফ এম রেডিওর কথাবার্তা আর প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ধরা দিক তার 'টাওয়ার' বা পরিষেবা। আর প্রযুক্তিও কিন্তু এই চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে প্রযুক্তির এই বিস্ময়কর ক্ষমতা কিন্তু তার উপভোক্তা হিসেবে আমরা সেইভাবে তারিফ করি না। প্রযুক্তির কাছে চাহিদা বেড়েই চলে কিন্তু যা পাওয়া গেল তার জন্য একেবারেই আমাদের সমীহ নেই। এই কারণে সম্ভবত প্রযুক্তিগত দিক থেকে অর্থাৎ প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনার দিক থেকে আমরা দেশ হিসেবে যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছি। আমরা যে কোনো প্রযুক্তির ব্যবহারকারী হতে যতটা আগ্রহী তার উদ্ভাবনার ক্ষেত্রে হয়ত ততটা উৎসাহী নই।

মোবাইল ফোন, অন্য আরও কিছু প্রযুক্তির মত কতগুলি নতুন সমস্যা বহন করে এনেছে। তবে এক্ষেত্রে প্রযুক্তিটিকে দায়ী করা ঠিক নয়, দায়ী করা উচিত তার অপপ্রয়োগ। ব্রিটেনে আজ থেকে প্রায় বারো বছর আগে পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন বা পেজারের ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়। তখনই বোঝা যায় যে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করার জন্য এগুলি কত শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। প্রযুক্তি ও পরিষেবার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল ফোনের সাহায্যে যে পরিমাণ অপকর্ম শুরু হয়েছে তা জন্ম দিয়েছে অপরাধ বিজ্ঞানের নতুন শাখার—পরিভাষায় যার নাম 'সাইবার ক্রাইম'। এই অপরাধের ফলে একদিকে ব্যক্তিগত জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অন্যদিকে দেশের তথা সমাজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। অথচ মোবাইল প্রযুক্তির সুবিধার তালিকা এতটাই বিস্তৃত তার সামগ্রিক বিবরণ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি দুটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করব যা মূলত মোবাইল ফোনেরই অবদান। প্রথমত মোবাইল ফোন কি আমাদের কিছুটা অপ্রয়োজনীয় মিথ্যে কথা বলতে শেখাচ্ছে? না হলে গড়িয়াহাটে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি শেয়ালদায় তার প্রতীক্ষায় যিনি রয়েছেন তাকে কেন বলেন 'মল্লিকবাজার এসে গেছি'! অবশ্য অপর প্রান্তের মানুষটিও ঠিক শেয়ালদায় পৌঁছে খোঁজ নিচ্ছেন কিনা বলা শক্ত। কোথাও প্রতিশ্রুতি মতো সময় না রাখতে পারলে মোবাইলে শেষ মুহূর্তে জানিয়ে দিচ্ছি দেরি হবে। কাজের সুবিধা তো মোবাইলের জন্য হয়েছেই কিন্তু কাজের তৎপরতা বেড়েছে কি? না কি ছুতো দেওয়ার একটা যন্ত্র হাতে চলে এসেছে? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি মোবাইল ফোন কিন্তু আমাদের সময়ানুবর্তিতা বাড়ায় নি, অথচ তা কিন্তু প্রত্যাশিত ছিল।

দ্বিতীয় যে বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি তার প্রভাব হয়ত আরও কিছুদিন বাদে স্পষ্টতর হবে যদিও তার আভাস এখনই পাওয়া যাচ্ছে। মোবাইলে বিশেষত স্কুল ও কলেজের নানা বয়সের ছাত্রছাত্রীরা অজস্র এসএমএস পাঠায়। অত্যন্ত দ্রুততায় এবং দক্ষতার সঙ্গে তারা এই কাজটি করে। ফলে একদিকে ভাষা হতে থাকে সংক্ষিপ্ততর—শব্দ হতে থাকে উচ্চারণ নির্ভর এবং বহু ক্ষেত্রে ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার সংমিশ্রণ।

ছাত্রছাত্রীদের কথাবার্তায় এর প্রভাব অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করেছেন এবং এর মধ্যে দিয়ে তরুণ প্রজন্মের শব্দভাণ্ডার কিছুটা হলেও হ্রাস পাচ্ছে। পড়াশোনায় বা পরীক্ষার খাতায় এই মুহূর্তে এর সামান্য ছাপ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এই গতি অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে হয়ত ভাষার বিষয়ে সমস্যাটা গভীরতর হবে। তরুণ প্রজন্ম যে ভাষা ও ভঙ্গীতে নিজেদের প্রকাশ করছে তার সীমাবদ্ধতা কিন্তু ধরা পড়তে শুরু করেছে। কমপিউটারে ই-মেল লেখার মধ্যে দিয়ে কাজটি শুরু হলে শব্দের, বাক্যের ও বানানের সংক্ষিপ্তকরণ মোবাইলের দৌলতে যেভাবে গতিলাভ করেছে তাতে হয়ত কেউ কেউ ঐ ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করতে শুরু করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তার পাঠক সংখ্যাও কিন্তু ঈর্ষণীয় পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে খুব তাড়াতাড়ি।

বহু অভিভাবকই বিদ্যালয়ে পাঠরত তার সন্তানকে মোবাইল ফোন দেন নিরাপত্তার কথা ভেবে। যন্ত্রটির অপব্যবহারের সম্ভাবনা যে তারা জানেন না এমন নয় তবু ছেলেমেয়েদের চলা ফেরা, কোচিং ক্লাসে যাওয়া প্রভৃতি বিষয়ে খোঁজ নিয়ে স্বস্তিবোধের প্রয়োজনে এটি তাদের করতেই হয়। দশ পনেরো বছর আগে যখন প্রযুক্তিটি ছিল না বা তার সহজলভ্যতা ছিল না তখন হয়ত অভিভাবকরা এই উদ্বেগ থেকে মুক্ত ছিলেন না। তবে উপায়ান্তর না থাকায় তা সম্ভবত মেনে নিতেন এবং উদ্বেগও থেকে যেত অনেক নিচু তারে বাঁধা। এখন কিন্তু অবস্থাটা পাল্টে গেছে। আমরা কি বলব প্রযুক্তিই এই উদ্বেগের জন্ম দিল? আসলে প্রযুক্তি কীভাবে আমাদের মনোজগতে প্রভাব বিস্তার করে, আমাদের সামাজিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এটা তার একটা নমুনা মাত্র। প্রযুক্তির এই ভয়ঙ্কর শক্তিশালী ভূমিকার সঙ্গে অবশ্য আমাদের ভুললে চলবে না যে বহু অভিভাবক অর্থনৈতিক কারণে সন্তানকে ঐ মোবাইল ফোন হাতে তুলে দিতে পারেনে নি। তারা সম্ভবত উদ্বেগ নিয়েই চলতে বাধ্য হচ্ছেন। যখন প্রযুক্তিটি আসে নি সমাজের সমস্ত অভিভাবকই একই মাত্রার উদ্বেগ নিয়ে সন্তানের স্কুল বা কোচিং ক্লাস থেকে ফেরার জন্য অপেক্ষা করতেন। তাহলে প্রযুক্তিই কি সামাজিক বিভাজনকে স্পষ্টতর করে দিল? একদল অভিভাবক হাতে পেয়ে গেলেন উদ্বেগ মুক্তির প্রযুক্তি আর এক দল প্রযুক্তির লভ্যতা সত্ত্বেও নিছকই অর্থনৈতিক কারণে তার থেকে বঞ্চিত রইলেন।

কবির ভাষায় প্রযুক্তির প্রাথমিক স্তর লক্ষ্য হয়ত বা বলা যায় 'সে আসে ধীরে'। কিন্তু অচিরেই তা হয়ে যায় 'ঐ আসে ঐ অতিভৈরব হরষে'। উপভোক্তা হিসেবে আমরা গোড়াতেই যে নতুন কোনো প্রযুক্তির জন্য যে ঝাঁপিয়ে পড়ি এমন নয়, বরং তার দিকে কিছুটা সন্দেহের দৃষ্টিতেই তাকাই এবং অগ্রসর হই কিছুটা দ্বিধা নিয়ে। সে পর্যায়ে প্রযুক্তিটি বিপণনের সঙ্গে যুক্ত বাণিজ্য মহল নানা চিত্তাকর্ষক প্রলোভন, যাকে পরিভাষায় বলা হয় 'অফার' দিয়ে উপভোক্তার মন জয় করার চেষ্টা চালায়। এই প্রাথমিক পর্যয়ে মানুষ উপভোক্তা হিসেবে প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের চেষ্টা করে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি একটি স্বল্পস্থায়ী পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়। কিন্তু উপভোক্তার অর্থনৈতিক দিক থেকে যদি প্রযুক্তিটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তাহলে তার প্রসার রোধ করা যায় না। যেমন ঘটেছে কমপিউটার, কিছু ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি এবং অবশ্যই মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রে। যখন এই প্রযুক্তি আমাদের জীবনে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে নেয় আমাদের সামাজিক আচরণ ও অভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করে তখনই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে প্রযুক্তিভিত্তিক সামাজিক বিভাজন। একদল সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করার ক্ষমতা রাখে অন্যদল তা পারে না—যদিও এই না পারার দলটি ক্রমাগত প্রয়াস দেয় অন্য শ্রেণীভুক্ত হওয়ার। এই প্রযুক্তি নির্ভরতা বৃদ্ধির ফলে প্রযুক্তি আমাদের চালনা করে। উপভোক্তা হিসেবে তাকে আর চালনা করতে অমরা পারি না এমন কি পারি না নিয়ন্ত্রণ করতেও।

ইতিহাসগত ভাবে দেখতে গেলে বলা যায় যে গত একশ বছরের বেশি সময় ধরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রযুক্তির উদ্ভাবনা সমাজকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করার ভূমিকা নিয়ে উঠে এসেছে। দেশ, কাল ও সমাজের ওপর নির্ভর করেছে তার প্রভাব—গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থেকেছে অর্থনীতিরও। আর প্রযুক্তি নানা সামাজিক পরিবর্তনের বাহক হিসেবে এসেছে।

এদের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব নিয়ে প্রশ্ন নেই, প্রশ্ন নেই তার ব্যবহার নিয়েও। কেবল ভাবনাটুকু রয়ে গেছে তার যথাযথ ব্যবহার ও প্রভাব নিয়ে। এই ভাবনা চিন্তাটা মোবাইল ফোন ঘিরে রয়েছে এবং অন্তত অদূর ভবিষ্যতেও সেটা জারি থাকবে বলে মনে হয়। কারণ প্রযুক্তিটি সম্ভবত আরও উন্নত হবে এবং ধরা দেবে তার নতুন নতুন প্রভাব। মিশে থাকবে ভালো-মন্দ দুইই। আমাদের আপাতত সেদিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে।

উমা

উৎস মানুষ পত্রিকার সডাক গ্রাহক হতে হলে:—

১। সডাক গ্রাহক চাঁদা বছরে ৮০ টাকা। বছরের যে কোনও সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যাবে। **United Bank Of India, College Street Branch, Kolkata-7000073 Utsa Manush. sb account no. 0083010748838**। এই অ্যাকাউন্ট নম্বরে আপনারা চেক অথবা টাকা জমা দিয়ে দেবেন এবং ফোন করে কিংবা মেল করে আমাদের জানিয়ে দেবেন।

গাছ কাটার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ

পূরবী ঘোষ

‘ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।’

গত ১৯ নভেম্বর, ২০১১, ‘একদিন’ সংবাদপত্রে ‘একটি ছাতিম গাছের মৃত্যু ও দু-চার কথা’ এই শিরোনামে একটি লেখা পড়লাম। লেখাটির মূল বিষয় বৃক্ষ নিধন। লেখকের বক্তব্য ই এম বাইপাসের ধারে পঞ্চসায়র অঞ্চলে নির্বিচারে প্রকাশ্যে বড় বড় গাছ কাটা হচ্ছে, অথচ শিক্ষিত, অভিজাত মানুষদের আবাসস্থল হওয়া সত্ত্বেও, এই গাছ কাটার বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ হচ্ছে না।

এই লেখাটা নিয়ে ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ আমার মুঠো ফোনটা বেজে উঠল। তুলে হ্যালো বলতেই একটা অচেনা তরুণ কণ্ঠের আহ্বান ভেসে এল, আগামী ২৬শে নভেম্বর ২০১১ রেল স্টেশনে গাছ কাটার প্রতিবাদ সভায় সামিল হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে। অনুরোধ শুনে অবাক হলাম। পঞ্চসায়রের মতো অভিজাত এলাকার বাসিন্দারা গাছ কাটার প্রতিবাদ করতে পারলেন না। অখ্যাত রেল স্টেশন কামারকুণ্ডু অঞ্চলের ছেলেরা নাকি সেই গাছ কাটা ঠেকাতে গড়ে তুলেছে প্রতিবাদ আন্দোলন।

কিছুটা কৌতূহল নিয়েই গুটি গুটি পায়ে ২৬ নভেম্বর শনিবার ৩টের সময় হাজির হলাম কামারকুণ্ডু স্টেশনে। স্টেশনে পৌঁছতেই এগিয়ে এল ইমন, মিঠুন, অর্ণব ইত্যাদি ১৮-২২-এর মধ্যে ঘোরাফেরা করা গুটিকয় ছেলে। কামারকুণ্ডু স্টেশনে বড় বড় গাছগুলো কেটে ফেলার প্রতিবাদে এরা একসঙ্গে জোট বেঁধেছে। রেল স্টেশনে শেডের প্রয়োজনীয়তা আছে একথা মাথায় রেখেও এরা বিরোধিতায় নেমেছে। উত্তরপাড়া, বারুইপাড়া, বেগমপুর, দিয়াড়া, নালিকুল ইত্যাদি স্টেশনগুলোতে শেড তৈরির অজুহাতে রেলের তরফে শুরু হয়ে গেছে বৃক্ষ নিধন যজ্ঞ। এর ফলে কাটা পড়ছে বড় বড় গাছগুলো। নীড়হারা হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে চড়াই, শালিক, গুয়েশালিক, গোবক, বাঁশপাখি ইত্যাদি নানা জাতির পাখি। শহরাঞ্চলে ইট কাঠের জঙ্গল বেড়ে যাওয়ায় এই পাখিরা দল বেঁধে আশ্রয় নিয়েছিল স্টেশন চত্বরের বড় বড় মহীরূহগুলোতে। আজ তারাও বাস্তুহারা হতে চলেছে। আগামী প্রজন্ম এই সব পাখি চিনবে বই-এর পাতা থেকে। এই কথাটা মানতে পারে নি ওই ইমন-সুব্রতরা। তাই তারা তাদের ছোট্ট কাঁধে তুলে নিয়েছে গাছ কাটার বিরুদ্ধে প্রচারের দায়িত্ব। কামারকুণ্ডু দিয়ে শুরু করে তারা বিভিন্ন স্টেশনে তাদের এই প্রচারকার্য চালিয়ে যাবে।

এই প্রচারকার্য শুরুর আগে এই ছেলেগুলো উপরিউক্ত স্টেশনগুলোতে নিত্যযাত্রীদের মধ্যে শেড তৈরি ও গাছ কাটা নিয়ে মতামতের সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে যে ৭৫% নিত্যযাত্রী মনে করেন প্রতিটি স্টেশনেই কিছু নতুন শেড প্রয়োজন, কিন্তু প্রায় প্রতিটি গাছ যথাযথভাবে বাঁচিয়ে। প্রায় ১০% যাত্রী মনে করেন নতুন শেড তৈরি করতে কিছু গাছ কেটে ফেলতে হলেও বেশিরভাগ গাছকে অক্ষত রেখে। ৫% মানুষ মনে করেন গাছ কেটেই টানা শেড নির্মাণ যেমন প্রয়োজন, তেমনি বিকল্প গাছ বসানোর দায়িত্ব রেলকেই নিতে হবে এবং বাকি প্রায় ১০% -এর মত রেলের জায়গায় রেল কি করবে তা সম্পূর্ণ রেলের বিষয়।

এই সমীক্ষার ফলে উঠে আসা মতামতের ভিত্তিতে এই ছেলেগুলোর মনে হয়েছে যে তাদের প্রতিবাদ আন্দোলন আরও জোরদার করা দরকার। আর তার জন্য তারা ডাক দিয়েছে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সমমনস্ক মানুষদের। বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা এইসব মানুষরা ২৬ তারিখের পথসভায় নানা রকম বক্তব্য রেখেছেন। গাছ থাকার সুফল ও না থাকার কুফল নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। এই ছোট ছোট ছেলেদের পথসভা কি পারবে রেলের কর্মকর্তা বা অধস্তন কর্মচারীদের ঘুম ভাঙ্গাতে?

গাড়োয়াল প্রদেশের চিপকো আন্দোলনের কথা কমবেশি আমরা প্রায় সকলেই জানি। কিন্তু পারব কি আমরা তাদের মতো গাছকে জড়িয়ে ধরে গাছ বাঁচাতে? পঞ্চসায়রের অভিজাত এলাকা থেকে শুরু করে হুগলি জেলার অখ্যাত গ্রাম্য স্টেশন কামারকুণ্ডু পর্যন্ত সব অঞ্চলেই আমরা, যারা সব জেনে, সব বুঝে বড় হয়ে গেছি, অথচ আধমরা হয়ে বেঁচে আছি তাদের ঘা দিয়ে বাঁচাতে পারবে কি ওই সবুজের দল? যদি পারে তবে নিশ্চয়ই বাঁচবে গাছ। উষ্ণায়ণ থেকে যদি বাঁচতে হয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শস্য শ্যামল সবুজ যদি রেখে যেতেই হয় তাহলে ওই অবুঝ কাঁচা সবুজ ছেলের দলের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামতেই হবে আমাদের। বাঁচাতেই হবে আমাদের শ্যামল সবুজ দেশটাকে।

উমা

জলাভূমি বাঁচাতে কেউ কেউ জেগে থাকে

অরুণ পাল

'জ'লাভূমি রক্ষা' শিরোনাম দেখেই কোনও কোনও পাঠক হয়তো মন্তব্য করে বসবেন, 'আর এইসব জলাভূমি-টুমি বলে কিছু লাভ নেই, সব ভরাট হয়ে যাবে। কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না।' কারও যদি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা পড়া থাকে, তিনি হয়তো সুনীলকে উদ্ধৃত করে বলবেন—'আমরা জানি না এক শতাব্দী পরেও এও পৃথিবী বেঁচে থাকবে কিনা'। এক শতাব্দী অনেকটা সময়। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বোধ হয় অতটা সময় দিচ্ছেন না। তাহলে আমরা কি করব? আমরা একটা বিশাল পাথর পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, চারপাশে তাকিয়ে আমরা টের পাচ্ছি সেই আসন্ন মহা ধ্বংস, চরম সর্বনাশের সংকেত। আমরা কি তাহলে চুপচাপ বসে থাকব নাকি সুনীলের সেই কবিতাটার শেষ লাইনগুলো উচ্চারণ করব,

'তবু আমরা এক সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে যাব
আমরা আগামী পৃথিবীর জন্য দিয়ে যাব
আমাদের ঘাম ও অশ্রু
আমরা পরবর্তীদের জন্য রেখে যাব অন্তত
একটি স্বপ্নের উপহার।'

আমরা সবাই সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি কিনা জানিনা কিন্তু কেউ কেউ যে পরবর্তীদের জন্য অন্তত একটি স্বপ্নের উপহার রেখে যাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমাদের এই হাওড়া হুগলি জেলার এইরকম কয়েকজনের কথা এখানে লিখব।

হাওড়া জেলার বালির সাপুঁইপাড়া অঞ্চলের অধিবাসী তপন দত্ত শহিদই হয়ে গেলেন ২০০০ বিঘার বিশাল এক জলাভূমি রক্ষা করতে গিয়ে। তপন দত্ত এদেশের পরিবেশ আন্দোলনের প্রথম শহিদ কিনা জানিনা, কিন্তু তিনি সত্যিই আক্ষরিক অর্থে আগামী পৃথিবীর জন্য নিজের জীবনটা উৎসর্গ করলেন। ২০০০ বিঘা জলাভূমি প্রায় সবটাই ভরাট হয়ে গেছে, কর্পোরেট হাউসের থাবার তলায় চাপা পড়ে গেছে জলাভূমিটি, যার অবস্থান ছিল দুটি বড় জাতীয় সড়ক দিল্লি রোড ও বম্বে রোডের সংযোগস্থলে, যার মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল তিনটি জল নিকাশি নালা। সাপুঁইপাড়া এলাকা প্রতি বছর বর্ষায় জলমগ্ন হয়ে থাকে, জল বেরোবার রাস্তা

এই পুকুর বোজানোরই চক্রান্ত চলেছে।

পায় না। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তপন দত্ত দেখলেন জলাভূমিটি ভরাট হয়ে যাচ্ছে। সহযোগী বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তুললেন 'জলাভূমি বাঁচাও কমিটি'। কি না করেছেন তিনি। ব্লক স্তর থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দপ্তর, পরিবেশ দপ্তর, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সর্বত্র লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। এলাকায় জনমত গঠনের জন্য ব্যাপক প্রচার করেছেন। হাইকোর্টে মামলা করেছেন, জলাভূমিটি ভরাট করার জন্য তৈরি হওয়া সিন্ডিকেট যে সব ট্রাকে করে মাটি আনছিল সেই সব ট্রাকগুলোর সামনে ব্যারিকেড করেছেন এলাকার ছেলেদের নিয়ে; কর্পোরেট হাউসের স্বার্থবাহী স্থানীয় থানার পুলিশ এসে অবরোধ তুলে দেয় অথচ হাইকোর্টের ভরাট বন্ধের জন্য স্থগিতাদেশ কার্যকরী করার জন্য তাদের টিকিটিও দেখা যায় নি। ভরাট হতে থাকা জলাভূমিটির সামনে সকলকে নিয়ে মাইক লাগিয়ে প্রচার করেছেন। আর সেই সময় কর্পোরেট হাউসের মদতপুষ্ট সিন্ডিকেটগুলো দলবল জুটিয়ে পাল্টা মাইক লাগিয়ে উচ্চস্বরে গান চালিয়ে সভা বানচাল করার চেষ্টা করেছে। জলাভূমি ভরাটে বাধা পেয়ে তপন দত্তকে ফোনে হুমকি দেওয়াও শুরু হল। ঘাতকরা তাকে মেরে ফেলার চেষ্টাও করল একবার। কিন্তু তপন দত্ত তাঁর লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন। শেষ পর্যন্ত গত ৬ই মে ২০১১ বালি থানা থেকে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় রাত পৌনে দশটা নাগাদ ঘাতকরা পয়েন্টব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে তাঁকে হত্যা করল।

হুগলি জেলায় অবস্থিত হিন্দমোটর কারখানার অন্তর্গত প্রায় ৮০০ বিঘা জলাভূমি ভরাট করার চক্রান্ত করছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে কিছুটা তারা বুজিয়েও ফেলেছে। শ্রীরামপুর মহকুমার নাগরিক সংগঠন 'গণউদ্যোগ'-এর সতর্ক প্রহরায় ভরাটের কাজ থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। স্থানীয় উত্তরপাড়ার পৌরসভা সমেত থানা, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি চাপাটি দেওয়া ছাড়াও গত কয়েক বছর ধরে এরা টানা প্রচার চালিয়ে গেছে ভরাটের বিরুদ্ধে। তাদের এই একটানা প্রচার আন্দোলন শীর্ষে পৌঁছায় বিগত নির্বাচনের আগে আমরণ অনশনের সিদ্ধান্তে। উত্তরপাড়ার কাঁঠালবাগানের কাছে মঞ্চ বেঁধে শুরু হয় অনশন। অনশনে বসেন সংগঠনের তৎকালীন সম্পাদক অনুপম দাস ও সুব্রত হালদার। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন পরিবেশ ও বিজ্ঞান সংগঠন সহ মানুষের অধিকার নিয়ে যেসব সংগঠন আন্দোলন করছে তারা প্রতিদিন মঞ্চে এসে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রেখেছে। টানা ছ'দিন অনশন চলার পর নানা কারণে যদিও অনশন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়, কিন্তু তার অভিঘাতে জলাভূমিটি আজও টিকে আছে। গণউদ্যোগের সতর্ক প্রহরা আজও চলছে। যেটাতে ঢিলেমি পড়লে কারখানা কর্তৃপক্ষ যে কোনও সময়ে জলাভূমিটি ভরাট করে ফেলতে পারে।

প্রতিবাদ করতে গিয়ে খুন হন এই তপন দত্ত

হুগলি জেলার জনাই অঞ্চলের অধিবাসী শঙ্কর হাজরা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। স্পন্ডিলাইসিস-এর রুগি একজন মানুষ, যিনি তাঁর চারপাশের প্রকৃতি পরিবেশ এবং প্রাণীদের রক্ষার জন্য সতত উদ্বিগ্ন এবং সক্রিয়। ডানকুনি কোল কমপ্লেক্সের ছেড়ে দেওয়া কোল গ্যাসের দূষণে আশেপাশের গ্রামবাসীরা নানান শারীরিক কষ্ট পাচ্ছেন। কোল কমপ্লেক্স-এর নালা দিয়ে বেরিয়ে আসা দূষিত বর্জ্য পদার্থে জীবনদায়ী বালিখাল বিষাক্ত জলের প্রবাহে পরিণত হয়েছে। শঙ্কর হাজরার চোখে ঘুম নেই। কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়েই গড়ে তুললেন 'দূষণ-বিরোধী মঞ্চ'। নিজের পকেটের পয়সায় মাইক ভাড়া করে প্রচার করছেন দূষণের বিরুদ্ধে। গ্রামে গ্রামে গণসাক্ষর সংগ্রহ করছেন। অসুস্থ শরীর নিয়ে ছুটছেন দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অফিসে, রাজ্য সরকারের দপ্তরে দপ্তরে, এইভাবে গত দু-দশক ধরে অক্লান্ত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন এই মানুষটি। শুধু ডানকুনি কোল কমপ্লেক্সের দূষণই নয়, ডানকুনির বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে থাকা জলাভূমি, যেগুলি নানা ধরনের দুষ্প্রাপ্য প্রাণীদের আবাসস্থল, সেগুলিকে সন্তানের মতো রক্ষার জন্য তাঁর চিন্তার শেষ নেই। সম্প্রতি ডানকুনিতে একটি রেলওয়ে প্রোজেক্ট করার বরাতপ্রাপ্ত এক ঠিকাদার সংস্থা প্রোজেক্ট এলাকায় শর্টকাট রাস্তা বানানোর জন্য এই জলাভূমির একটা বিরাট অংশ ভরাট করে ফেলেছে। শঙ্কর হাজরা শুরু করলেন ছুটোছুটি। বিভিন্ন পরিবেশ সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে এসে ভরাট করা অঞ্চল পরিদর্শন করালেন, ছবি তোলালেন। এই অঞ্চলের জলাভূমি একটা বিশাল এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বিরাট ভূমিকা পালন করে আসছে। শঙ্কর হাজরা এই জলাভূমি রক্ষার জন্য আইনি লড়াই-এর কথা ভাবছেন। তিনি দেখা করেছেন পরিবেশবিদ সুভাষ দত্তের সঙ্গে। সুভাষ দত্ত অভিমত প্রকাশ করেছেন ইস্ট-ক্যালকাটা ওয়েটল্যান্ড অ্যাক্টের মত এইসব জলাশয় রক্ষার জন্য অনুরূপ আইন থাকা উচিৎ। শঙ্কর হাজরার মতো মানুষদের অতন্দ্র প্রহরা পারবে কি এই পৃথিবীটাকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে?

এবার আসা যাক হাওড়া শিল্পাঞ্চলে। এই অঞ্চলের প্রায় সমস্ত পুকুরগুলি গত কয়েক দশকে বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। এদিক এদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কয়েকটি পুকুর এখনও পড়ে রয়েছে, যেগুলি বাঁচাবার জন্য স্থানীয় মানুষজন, ক্লাব সংগঠন ও এ পি ডি আর অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। হাওড়ার জগাছা থানার অন্তর্গত মণ্ডল পাড়ার ষষ্ঠীতলা এইরকমই কুড়ি কাঠার একটি পুকুর, যেটিতে বিষ নজর পড়েছে এলাকার এক প্রোমোটারের। পুকুরটির চারপাশে কারখানা, দোকান, চারটি বহুতল ফ্ল্যাটবাড়ি সহ ঘনবসতি অঞ্চল। পুকুরটিকে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যাবে কিনা জানি না, কিন্তু স্থানীয় ক্লাব সংগঠনগুলিকে নিয়ে এ পি ডি আর হাওড়া সদর শাখার সম্পাদক বৈদ্যনাথ খোটেল দৌড়চ্ছেন সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে দপ্তরে। স্থানীয় থানা, হাওড়া কর্পোরেশনের মেয়র, পুলিশ কমিশনার থেকে শুরু করে জেলা ও রাজ্যের মৎস্য দপ্তর, পরিবেশ দপ্তর, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এমন কি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে পর্যন্ত গণসাক্ষর সম্বলিত দরখাস্ত পাঠিয়েছেন। এখন বাকি রয়েছে মুখোমুখি সংঘাত, এলাকার মানুষকে নিয়ে পুকুরের চারপাশে মানব শৃঙ্খল গড়ে তোলা। এছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই।

উমা

বনবিহারী ও বনফুল

সমীরকুমার ঘোষ

গত সংখ্যার পর

ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ওরফে বনফুলের চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষাগুরুই ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর সাহিত্যগুরুও। আত্মজীবনী 'পশ্চাৎপট'-এর পাতায় পাতায় মুক্তকণ্ঠে সেই কথা স্বীকার করেছেন বনফুল। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের শিক্ষাগুরুকে লিখেছেন অসাধারণ এক উপন্যাস 'অগ্নীশ্বর'। বনফুল-বর্ণিত বনবিহারীই এবারের কথায়।

'মেডিকেল কলেজের জীবনে আমার আর একটি পরম-প্রাপ্তির কথা এইখানেই বলি। যেটি ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সহিত পরিচয়। তাঁহার সহিত পূর্বেই সামান্য পরিচয় ছিল, যখন তিনি কাটিহারে রেলওয়ে মেডিকেল অফিসার ছিলেন। আমাদের বাড়ি মণিহারী হইতে কাটিহার খুবই কাছে। আমার বাবা কখনও কখনও 'কনসাল্ট করিবার জন্য তাঁহাকে 'কল' দিতেন। সেই সময় মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিয়াছি। মেডিকল কলেজে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইল, খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি। আমার সহিত পূর্বপরিচয়ের জন্য হোক, কিংবা আমি লেখক বলিয়াই হোক, আমাকে কিছু আমল দিয়াছিলেন। আমি আমার লেখা তাঁহাকে দেখাইতে সাহস করি নাই। তিনি নিজেই একদিন বলিলেন, 'তোমার 'প্রবাসী'র কবিতাটা ভালো হয়েছে।' বনবিহারীবাবু প্রথমে মেডিকেল কলেজে সার্জিকাল আউটডোরে আসিয়াছিলেন, পরে সার্জিকাল রেজিস্টার হন। সেই সময় আমি তাঁহার সহকারী ছাত্র ছিলাম। সেই সময় আমি তাঁহার বাসাতেও দুই একবার গিয়াছি। তাঁহার প্রাক্‌টিস একেবারেই ছিল না। প্রাক্‌টিস করিতে হইলে যে ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি থাকা প্রয়োজন সেইটারই অভাব ছিল তাঁহার। দুই-একটি রুগী জুটিলে টিকিত না। তিনি কাহারও সহিত দুর্ব্যবহার করিতেন না। কিন্তু প্রখরতা এত অধিক ছিল যে কোনও রোগীর আত্মীয়স্বজনের কোনরূপ বেচাল তিনি সহ্য করিতেন না। তাহাদের হামবড়া ভাব বা ডাক্তার বিদ্যা ফলানোর চেষ্টা দেখিলেই তিনি মুখের ওপর এমন তীক্ষ্ম ব্যঙ্গ করিতেন যে লোকটি চুপ হইয়া যাইত। যাহাকে মোটা ফি দিয়া ডাকিয়াছি তিনি বিনীত লোক হইবেন ইহাই সকলে প্রত্যাশা করিত। কিন্তু বনবিহারীবাবুর সে জাতীয় লোক ছিলেন না।'

বনবিহারীর চরিত্রের এই দিকটার নানা উদাহরণ আছে বনফুলের 'অগ্নীশ্বর' উপন্যাসে। সেখানে বনফুল লিখছেন—একবার এক প্রবীণ ডেপুটির হাঁটুতে ব্যথা হয়েছিল তিনি ডাক্তার অগ্নীশ্বরকে দেখিয়েছিলেন। তার মাস তিনেক পরে এসে বলেন, 'অগ্নিবাবু, এ হাঁটু তো সারল না, কত আর নেংচে বেড়াই বলুন, আপনার প্রেসকৃপশনটাই দিন, ট্রাই করে দেখি ওটা—

'আপনাকে তো প্রেসকৃপশন দিয়েছিলাম একটা মাস তিনেক আগে—খাননি সে ওষুধ?'

ডেপুটি বললেন, 'না, সেটা আর খাওয়া হয়নি। আমার বেহাই বললেন, বিধানবাবুকে দেখাতে। তিনি ব্লাড কেমিস্ট্রি করালেন, পাইখানা পেচ্ছাবও পরীক্ষা করালেন। তারপর এমন এক ওষুধ লিখে দিলেন যে, ওষুধ জোগাড় করতেই মাসখানেক লেগে গেল, এখানে পাওয়া গেল না, বম্বে থেকে আনাতে হল, একটি গাদা দাম লাগল, কিন্তু কিচ্ছু হল না। তারপর গেলাম ব্রাউন সাহেবের কাছে, তিনি মালিশ দিলেন, ইনজেকশন দিলেন, ওষুধও খাওয়ালেন চার-পাঁচরকম—' অগ্নীশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার ক্রেসকৃপশনটা ব্যবহারই করেননি?' 'না, সেটা আর ব্যবহার করা হয়নি। হারিয়েও ফেলেছি সেটা। দিন আর একবার লিখে দিন, ট্রাই করে দেখি এবার ওটা—'

'আর তো লিখব না। সেবারই একটা অন্যায় করে ফেলেছিলুম ফি নিইনি—'

ডেপুটিবাবু একটু থতমত খেয়ে গেলেন। তারপর কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, 'বেশ, এবার ফি দেব। কত ফি নেন আপনি—? 'লক্ষ টাকা দিলেও আর লিখব না'— গর্জন করে উঠল অগ্নীশ্বর। তারপর একটু থেমে বলল,—'একটা শর্তে লিখতে পারি, যদি ওই ফোলা হাঁটু গেড়ে করজোড়ে প্রার্থনা করেন—দয়া করে সেই প্রেসকৃপশনটা আবার লিখে দিন। তবেই দেব, তা না হলে নয়—' ভদ্রলোক গুম হয়ে বসে রইলেন মিনিট খানেক। তারপর উঠে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, আপনি যে এত অভদ্র, তা জানা ছিল না আমার—'অগ্নীশ্বর বসে বসে পা দোলাতে দোলাতে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। এ লোকের কখনও প্র্যাকটিস হয়?'

এ তো গেল বনফুলের গল্পের চরিত্রের কথা। কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই বনবিহারী যে সে রকম ছিলেন তার প্রমাণও আছে। বনফুলের মুখে শোনা তেমনই দুটি ঘটনার উল্লেখ আছে পরিমল গোস্বামীর 'স্মৃতিচিত্রণ'-এ। সেগুলি উল্লেখের আগে 'অগ্নীশ্বর'

উপন্যাসে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ওষুধে কাজ না হওয়া নিয়ে খানিকটা তীর্যক ভঙ্গিতে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। বিশেষত বিধানবাবুকে বাংলার মানুষ সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী মনে করতেন, যাঁর চিকিৎসা নিয়ে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য রূপকথা। কেন এমন মন্তব্য সে কথায় পরে আসছি। তার আগে পরিমলবাবু বর্ণিত ঘটনা দুটি জেনে নেওয়া যাক।

'একবার এক ভদ্রলোক কোনো রোগীর জন্য বিশেষ একটি ওয়ার্ডে বেড পাওয়া যাবে কিনা জানতে এসেছিলেন বনবিহারীবাবুর কাছে। বনবিহারীবাবু বেশ ভদ্রভাবে তাঁকে বললেন, 'এখন বেড খালি নেই, মাঝে মাঝে এসে খোঁজ ক'রে যাবেন।'

কথাটি স্বভাবতই ভদ্রলোকের মনের মতো হয় নি, অতএব তিনি পুনরায় অন্যত্র চেষ্টা করতে গেলেন, কিন্তু যাঁর কাছে গেলেন তিনিও পুনরায় ভদ্রলোককে বনবিহারীবাবুর কাছেই নিয়ে এলেন। বনবিহারীবাবু চকিতে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বললেন, 'বসুন'। খুব আদর করে কাছে বসালেন। তার পর তাঁর হাতের কাজ সেরে দাঁড়িয়ে উঠে ভদ্রলোকের কানের কাছে মুখ নিয়ে আগে যে সব কথা বলেছিলেন, সে সব কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন। বললেন, 'এখন বেড খালি নেই, মাঝে মাঝে খোঁজ করে যাবেন।' এক কানে ব'লে, ঐ কথাই আর এক কানে বললেন, এবং একবার এ কানে একবার ও কানে বলতে লাগলেন। তার পর দু চার জন ছাত্রকে ডেকে বললেন, 'আমি আর বলতে পারছি না, এবারে এক এক করে তোমরা বলতে থাক, ইনি সহজে বুঝতে পারেন না, কিন্তু এঁকে বোঝাতেই হবে এখন বেড খালি নেই, মাঝে মাঝে খোঁজ নিতে হবে, তোমরা সে ভার নাও।'

ভদ্রলোক প্রথমে হঠাৎ ধারণাই করতে পারেন নি কি ব্যাপার, কারণ ঘটনাটি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং অতর্কিত, কিন্তু যখনই বুঝলেন তখনই লজ্জায় অত্যন্ত বিপন্ন বোধ ক'রে দ্রুত পালিয়ে গেলেন সেখান থেকে।

আর একটি ঘটনাও উল্লেখযোগ্য, একদিন বনবিহারীবাবু আউটডোরে রোগী দেখছিলেন, এমন সময় উপস্থিত রোগীদের ভিড় ঠেলে এক ভদ্রলোক কোনো এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তারের পরিচয়-পত্র নিয়ে এগিয়ে এলেন বনবিহারীবাবুর কাছে, এবং সেই চিঠিখানি তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, 'আমাকে একটু আগে দেখে দিন দয়া ক'রে।'

বনবিহারীবাবু চিঠিখানি দেখেই ছাত্রদের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'ইনি ডাক্তার '-'-এর চিঠি এনেছেন, তোমরা সবাই মিলে এঁকে নিয়ে নাচো, আমিও কাজ শেষ ক'রেই আসছি।'

ডাক্তারি পড়ার সময় বনবিহারীর কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন। কিন্তু বনফুল সবসময় বলতেন—'মেডিকেল কলেজে তাঁহার নিকটা আমি পড়িয়াছি। কিন্তু, তিনি আমার প্রকৃত শিক্ষক ছিলেন সাহিত্যের ক্ষেত্রে। লেখার জন্যই আমাকে স্নেহ করিতেন তিনি। কিছু প্রশ্রয়ও দিতেন। সেই সাহসে আমি ভাগলপুরে থাকিতে আমার অনেক লেখা তাঁহাকে ডাকযোগে পাঠাইয়া দিতাম পড়িবার জন্য। স্কুলে মাস্টারমশাইরা পূর্বে যেমন ছেলেদের Exercise book সংশোধন করিয়া দিতেন তেমনি তিনি আমারও অনেক লেখা সংশোধন করিয়া পাঠাইতেন। সঙ্গে দীর্ঘ চিঠিও থাকিত। চিঠি নয়, যেন বেত। সাহিত্যের প্রকৃত সমজদার ছিলেন তিনি। অত্যন্ত কড়া সমালোচক। কোনওরকম শৈথিল্য সহ্য করিতেন না। আমার সাহিত্য-সাধনার পথে তিনি প্রথম শ্রেণীর 'গাইড' ছিলেন একজন। তাঁহার পরামর্শেই আমি অনেক ভালো ভালো বিদেশী লেখকদের গ্রন্থ পড়িয়াছিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি ভাগলপুরে গিয়া কিছুদিন ছিলেন। তখন তাঁহাকে আমার লেখা পড়িয়া শুনাইতাম। ভালো লাগিলে বলিতেন—নট্ মল্লার জমেছে'। না জমিলে, মৃদু হাসিয়া বলিতেন—সুর ঠিক বাঁধতে পার নি। বেসুরো ঠেকছে মাঝে মাঝে। আগাগোড়া ঢেলে লেখ।'

বনবিহারীর যে পত্র-বেতের কথা বনফুল লিখেছেন, প্রসঙ্গত তার নমুনা একটা পেশ করা যেতে পারে।

Bogra
1-6-39

বনফুল,

পাখীটাঙানতে আমাকে ঠকিয়েছ। কারণ fact is stranger than fiction.

বৈতরণীর ডাক্তারকে অপ্রকৃতিস্থ পাগল জেনেই সমালোচনা করেছি। পাগলেরও একটা fixed idea & responsiveness to one sort of stimuly only থাকা দরকার।— তোমার পাগল যেমন কোথাও আনন্দে আটখানা হয় না। তার মনের morouseness নিয়ে সে সবটা বেঁকিয়ে দেখবে, 'ফিক্‌ফিক্' হাসি তার মুখ থেকে আর এক সুরে বেরুবে ইত্যাদি। মড়ার evolution-টা তত important আপত্তি নয় আমার। ওটাকে class ও-তে ফেলেছি। কারুর সঙ্গে কথা কইবে না সেটা জানি। তোমার লেখায় সেটা স্পষ্ট হ'লে পাগলের ক্ষতি হ'ত না। আর একটা কথা, পাগলের অসম্বন্ধ প্রলাপ নিয়ে এক প্যারা লেখা যায়, একটা বই লেখা যায় না। বই-এর পাগল একটু সুসম্বন্ধ কথাবার্তা কইবে, এবং কথায়-বার্তায় নিজের পাগলত্ব দেখাবে। যাই হোক আমি তোমাকে আমার কথা বোঝাতে পারব না। আমি বোঝাতে পারব না যে, তোমার ঐ কখানা বই একত্র করলে Epic হবে না, ও বইগুলা first class material দিয়ে second class construction হয়েছে, যা Engineer-র চোখ এড়াতে পারবে না। নিন্দা শুন্‌তে যদি ভালবাস,— তবলা বাঁধা হবার আগে গান আরম্ভ ক'রে লম্বকর্ণ শ্রোতাদের তাক্ লাগাবার প্রবৃত্তি যদি কম

থাকে ত তোমার উচিত আমার কাছে এসে খানিকক্ষণ হাতুড়ির ঠক্‌ঠক্‌ সহ্য করা। কারণ আমার বিশ্বাস তোমার অন্য সমঝদাররা একটু আধটু বেসুরে বিক্ষুব্ধ হন না। এবং তুমিও সেই কুসংসর্গে পড়ে বেসুরে সুরসাধনা আরম্ভ করচো।

ছেলেবেলায় Chekov-এর Ward No 6 & Black Monk প'ড়ে খুব ভাল লেগেছিল। এখন কেমন লাগবে জানি না। তুমি যদি না প'ড়ে থাক ত প'ড়ে দেখতে পার, পাগলের খবর পাবে। ভাল soliloquyও দু'একখানা পড়া দরকার। একটা আমার মনে পড়চে— 'Uncanny tales by M. Crawford'-এর একটা গল্প। আরও খুঁজলে পাওয়া যাবে।

গরমে তোমরা আমাদের ঠকাতে পারবে না।

শুভার্থী— বনবিহারী মুখোপাধ্যায়

ডাক্তার হিসাবে বনবিহারীর পসার তেমন ছিল না। কিন্তু তিনি যে প্রথম শ্রেণীর ডাক্তার ছিলেন, তা নিয়ে বনফুলের কোনও সন্দেহ ছিল না। নিজে ডাক্তারির ছাত্র হিসাবেই নয়, নিজের জীবন-অভিজ্ঞতা দিয়েই সেটা তিনি বুঝেছিলেন।

একবার হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত হন বনফুল। তখন থাকতেন কলকাতার শিয়ালদায়, শিবদাস বলে এক বন্ধুর দাদার কোয়ার্টারে বাড়িতে পেইং গেস্ট হিসাবে। তিন দিন কুইনাইন খাওয়ার পরও জ্বর না ছাড়ায় বনবিহারীকে খবর দেন শিবদাস। তিনি এসে পরীক্ষা করে বলনে লোবার নিউমোনিয়া হয়েছে। বনফুলের বাবাকে খবর দেওয়া হয়। বাবা- মা দুজনেই কলকাতায় চলে আসেন। বনবিহারী তখন থাকতেন শ্যামবাজারে। সেখান থেকে রোজ হেঁটে দেখতে আসতেন। ট্যাক্সি চড়ে আসতেন না। 'বলতেন, কয়েক মিনিট আগে এসে কিছু লাভ তো হবে না। মাঝখান থেকে কিছু পয়সা নষ্ট হবে তোমাদের। আমি রোজই সন্ধ্যায় হেঁটে বেড়াই। আমার কিছু কষ্ট হয় না।' তখনও পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হয়নি। সুতরাং নিউমোনিয়া তখন ভয়াবহ অসুখ ছিল। বনফুলের অসুখ ক্রমশ বাড়তে থাকে। প্রলাপ বকা তো ছিলই জ্ঞানও হারিয়ে ফেলতে থাকেন। একদিন অবস্থা খুব সঙ্গীন হয়ে ওঠে। নিজে চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও বনফুলের বাবা বেশ ঘাবড়ে যান। বনবিহারী বলেন, 'আমার মনে হচ্ছে, মরফিন ইঞ্জেকশন না দিলে ডিলিরিয়াম থামানো যাবে না। কিন্তু নিউমোনিয়া অসুখে মরফিন দেওয়া মানা। তাই আর একজন ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করতে চাই। আপনিও ডাক্তার, কিন্তু আপনার ছেলের অসুখ, তাই আপনার সঙ্গে কনসাল্ট করাটা ঠিক হবে না। পাড়ায় যদি অন্য কোনও ডাক্তার থাকে তাকেই ডেকে আনুন।'

বনফুলের বাবা ও শিবদাসের দাদা নারান পাড়ার একজন ডাক্তারের খোঁজে বেরোন। বনফুলের মা তখন পাশের ঘরে বসে ঠাকুরকে ডাকছিলেন। ওঁরা বেরিয়ে যেতে তিনি ঘরে এসে কাউকে দেখতে না পেয়ে বনবিহারীবাবুকে জিজ্ঞেস করেন ওঁরা কোথায়। বনবিহারীবাবু তাঁকে খোলাখুলিই জানান সব কথা। শুনে মা বলেন, 'আপনি যে ইঞ্জেকশন দেবেন ঠিক করেছেন, তা এখনি দিয়ে দিন। দেরি করে কী হবে। অন্য ডাক্তার কি আপনার চেয়ে ভালো ডাক্তার? আপনার ওপর আমার খুব বিশ্বাস। যা করবার আপনিই করুন। এখনি ইঞ্জেকশন দিয়ে দিন।

বনফুল লিখেছেন, 'বনবিহারীবাবুর ঠাকুরদেবতায় আস্থা ছিল না। কিন্তু মায়ের কথায় এমন একটা জোর পাইলেন যে ডাক্তার আসিবার পূর্বেই আমাকে ইন্‌জেকশন দিয়া দিলেন।... জ্বর ছাড়িয়া গেল বটে, কিন্তু দুই-তিন দিন পর আবার রোজ কম্প দিয়া জ্বর আসিতে লাগিল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়-কে ডাকা হইল। তিনি আসিয়া আমাকে ভালো করিয়া দেখিলেন। অবশেষে বলিলেন 'প্লুরায়' নাকি পুঁজ জমিয়া আছে। পাঁজরের হাড় কাটিয়া পুঁজটি বাহির করিয়া দিতে হইবে। তিনি চলিয়া গেলে বনবিহারীবাবু বাবাকে বলিলেন, 'এই সব মহারথী ডাক্তারদের পাল্লায় পড়িলে বলাই আর বাঁচিবে না। আপনি ওকে নিয়ে পালান। আপনার বাগান আছে। সেখানে একটা গাছের তলায় একটা চৌকি-পাতা বিছানা করে দেবেন। বলাই সকালবেলা আপনার ঘরের গাই-এর দুধ খেয়ে চলে যাবে। দুপুরে ভাত আর মুর্গীর ঝোল বাগানে পাঠিয়ে দেবেন। ওষুধের মধ্যে কেবল কডলিভার অয়েল খাবে খাওয়ার পর। তারপর বিকালে বাড়িতে এসে জ্বরের জন্যে অপেক্ষা করবে। জ্বরের সময় দুধ-সাবু খেতে দেবেন। আমার বিশ্বাস এতেই জ্বর বন্ধ হয়ে যাবে।'

বনফুলের বাবা বিধানচন্দ্র রায় নয় বনবিহারীর কথাই শোনেন। ছেলেকে নিয়ে মণিহারী চলে যান। বাগানের মুক্ত বাতাসে কাঁচামিঠে আমগাছের তলায় বনবিহারীর প্রেসক্রিপশন মতো দুধ, মুরগির ঝোল-ভাত খেয়ে বনফুল সত্যিই সুস্থ হয়ে যান। এজন্য ওঁর মাকে অবশ্য খানিক হ্যাপা পোহাতে হয়েছিল। মুসলমান চাকর গাদা তেল-মসলা দিয়ে মাংস রান্না করছে, তা রোগীর পথ্য হচ্ছে না দেখে, তিনি নিজেই রান্না করতে থাকেন। তবে রান্নার পর তখনকার দিনের নিয়মমতো রোজ ওঁকে চান করতে হত।

বনবিহারী ডাক্তার হিসাবে কেমন ছিলেন, কেমন ছিল তাঁর আত্মবিশ্বাস, এই ঘটনাটি তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ডাক্তারি পাস করার পর বনফুল পাটনা মেডিকেল কলেজে জুনিয়র হাউস সার্জন রূপে মনোনীত হন। সেখানে যোগ দিতে গিয়ে দেখেন কাজের প্রথম শর্ত হল— যখন কোনো ছাত্র বা জুনিয়র অফিসার উর্ধ্বতন কারও কাছে যাবে, তাকে অবশ্যই সেলাম ঠুকতে হবে। এই শর্ত অপমানজনক মনে হওয়ায় ডেপুটি সাহেবের মুখের ওপর 'কাজ করব না' বলে চলে আসেন বনফুল। তারপর ঠিক করেন, প্যাথলজির বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে বড় শহরে

ল্যাবরেটরিতে প্র্যাকটিশ করবেন। তাতে সাহিত্য-সাধনা চালিয়ে যেতে পারবেন। জেনারেল প্র্যাকটিশনার হলে তা পারবেন না। সেই সময় স্পেশাল ট্রেনিংয়ের কোনো কোর্স ছিল না। কোনো বিশেষজ্ঞের অধীনে থেকে কাজ শিখতে হত। কিন্তু বিশেষজ্ঞ ছিলই খুব কম। তাঁদের মধ্যে চারুব্রত রায়ের খুব নাম ছিল। কিন্তু তাঁকে গিয়ে বলতে তিনি ধমক দিয়ে পাটনায় কাজ দিতে বলেন। ট্রেনিং দিতে আদৌ রাজি হন না। এই যখন অবস্থা, তখন আবার মুশকিল আসান হিসাবে আবির্ভাব সেই বনবিহারী মুখোপাধ্যায়েরই। বনফুল খবর পেয়েছিলেন, চারুবাবু বনবিহারীবাবুরই ছাত্র। তাই উনি বনফুলের জন্য বলে দিলে চারুবাবুর পক্ষে না বলা মুশকিল হবে। এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই বনফুল বনবিহারীর শরণাপন্ন হন। সব কথা শুনে বনবিহারী তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে কী বলেছিলেন বনফুলের বর্ণনায় তা দেখা যাক—'সব শুনিয়া ডান-পাটা নাচাইতে নাচাইতে তিনি বলিলেন, 'দেখ বনফুল, যে দেশে জন্মেছ সে দেশে বাঁচতে হলে সেলাম করতেই হবে। চাকরিতে একজন ভদ্র শিক্ষিত সাহেবকে সেলাম করে খুশী রাখতে পারলে আর কাউকে সেলাম করতে হবে না। আর চাকরি যদি না-ও করো তাহলে হাজার হাজার বাজে লোককে সেলাম করতে হবে। তা না হলে প্রাইভেট প্র্যাকটিশ জমবে না। তুমি একটা ভাল চাকরি পেয়ে ছেড়ে দিচ্ছ?' আমি তখন বলিলাম, 'আমি সাহিত্য-চর্চা করতে চাই, ল্যাবরেটরি প্র্যাকটিশ করলে তার জন্য সময় পাবো। চাকরী করলে তা পাব না। জেনারেল প্র্যাকটিশ করলেও তা সম্ভব নয়।'

বনবিহারীবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, 'অকূল সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ো তা হলে।'

এরপর বনফুলের সামনেই তিনি চারুবাবুকে ফোন করে বলে দেন। এবং বনফুলের অনুমান সত্য ছিল, মাস্টারমশাইয়ের অনুরোধ ফেলতে পারেননি চারুবাবু। বনফুল ওঁর কাছেই প্যাথলজির প্রশিক্ষণ নেন। শুধু তাই নয়, পরীক্ষার জন্য মাইক্রোস্কোপ থেকে নানা জিনিস কেনা-রাখা সবেরই ব্যবস্থা করে দেন চারুবাবু। এমনকি টিফিনের সিংহভাগটা বনফুলকেই খাইয়ে দিতেন। এই সুযোগ লাভ ও প্রাপ্তিযোগের নেপথ্যে বনবিহারীবাবুরই অনেকখানি অবদান, এ কথা বারবার স্বীকার করেছেন বনফুল। লিখেছেন—'ডাক্তার হিসাবে তিনি প্রথম শ্রেণীর ডাক্তার ছিলেন। মেডিকেল কলেজে নামকরা ছাত্র ছিলেন তিনি। শুধু ডাক্তারী জ্ঞান নয়, সাহিত্য জ্ঞানও তাঁহার গভীর ছিল। শুধু বাংলা সাহিত্য নয়, ইংরাজি এবং সংস্কৃত সাহিত্যের গভীরেও তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম আমি।'

ডাক্তারি, সাহিত্য-সমঝদার, লেখক, ব্যঙ্গচিত্রীর অন্য এক বনবিহারীকেও আমরা বনফুলের বর্ণনায় পাই। যিনি কোমলে-কঠোরে-মেশা এক অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। 'মাঝে মাঝে যেদিন তিনি 'প্রাইভেট কল' পাইতেন সেদিন তিনি আমাদের সিনেমা দেখাইতেন, হোটেলে খাওয়াইতেন।' লিখছেন বনফুল। 'বলিতেন, খোঁজ করো কোন সিনেমায় কম ভীড় সেখানেই যাব। এখানে ভালো সিনেমায় ভীড় হয় না। হোটেলে গিয়াও তিনি মেনুতে সেই খাবারগুলি বাছিয়া বাছিয়া দাগ দিতেন যেগুলি সাধারণতঃ লোকে খায় না। বলিতেন, চপ, কাটলেট, রুটি, অমলেট তো সবাই খায়—অন্য জিনিস খেয়ে দেখ। মনে পড়িতেছে একবার কি একটা ষ্ট্যু লইয়া আমরা একটু বিপদে পড়িয়াছিলাম। চেহারাটা দেখিয়া ঘাবড়াইয়া গেলাম সকলে। দেখিতে অনেকটা যেন বমির মত। বনবিহারীবাবু ওয়েটারকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—এ ষ্ট্যু আর কাউকে খেতে দেখেছো তুমি? খেয়ে বেশ সুস্থ চিত্তে ফিরে গেছে? ওয়েটার বলিল—হ্যাঁ, ভালো জিনিস। আপনারা খান। খাইয়া খুব খারাপ লাগে নাই।'

বনফুল যখন প্রবল বেগে লিখে চলেছেন, তখন তাঁকে প্রায়শই ভর্ৎসনা করে চিঠি লিখতেন বনবিহারী। তাতে লিখতেন—'তুমি এত বেশী লিখিতেছ কেন? ধীরেসুস্থে লেখ। তাড়াতাড়ি ফুরাইয়া যাইও না।' গুরুর কথা তখন সৃষ্টির প্রবল তাড়নায় রাখতে পারেননি বনফুল। কিন্তু বনবিহারীবাবু যে এমন উপদেশ দেওয়ার হকদার, তাও জানতেন। কারণ তিনি নিজেই ছিলেন বনবিহারীর লেখার দারুণ ভক্ত। 'বনবিহারীর ব্যঙ্গ-রচনা ও তাঁহার আঁকা কার্টুনগুলি অপূর্ব। তাঁহার পূর্বে ডি. এল. রায় বঙ্গসাহিত্যকে সার্থক ব্যঙ্গ রচনা দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। সেগুলি তাঁহার রচনাবলীতে সুরক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বনবিহারীবাবুর রচনাগুলি হারাইয়া গেল। নানা পত্রিকায় সেগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সেইগুলি একত্রিত করিয়া একটি গ্রন্থে নিবদ্ধ করিলে বাংলা সাহিত্য রসিকরা একটি অমূল্য সম্পদ পাইতেন। কিন্তু কেহই সে বিষয়ে উদ্যোগী নহেন। তাঁহার পুত্র বাঁচিয়া আছেন। তিনিই আইনত ইহা করিবার একমাত্র অধিকারী। কিন্তু তাহার এ-বিষয়ে উৎসাহ নাই। দুর্ভাগ্য!' আফসোস করে জানিয়েছিলেন বনফুল। আফসোস আমাদেরও। এত বছর হয়ে গেল আমরাও কেউই বনবিহারী-সৃষ্ট সম্পদ উদ্ধারে এগিয়ে এলাম না। **(পরের অংশ আগামী সংখ্যায়)**

উমা

বাণিজ্যিক নয় মানবিক
স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা।

প্রাপ্তিস্থান: পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস্ বুক সোসাইটি, বই-চিত্র, অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ), অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিত ভট্টাচার্য (উষুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া)। শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল। পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন নম্বর: ৯৮৩০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০-১২৬৩৭।

আবহাওয়া নিয়ে বিশেষ ক্রোড়পত্র

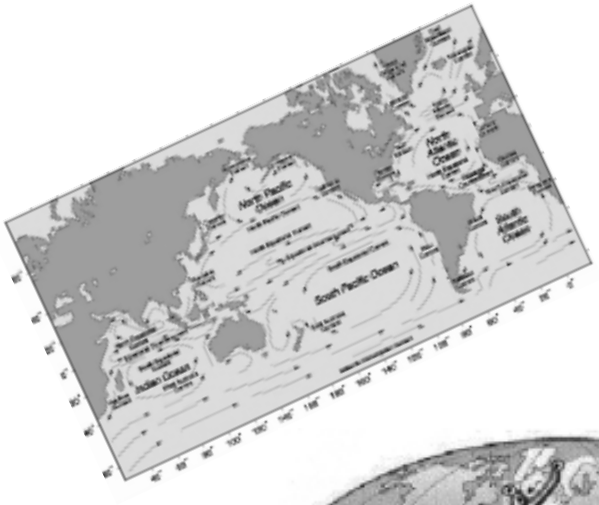

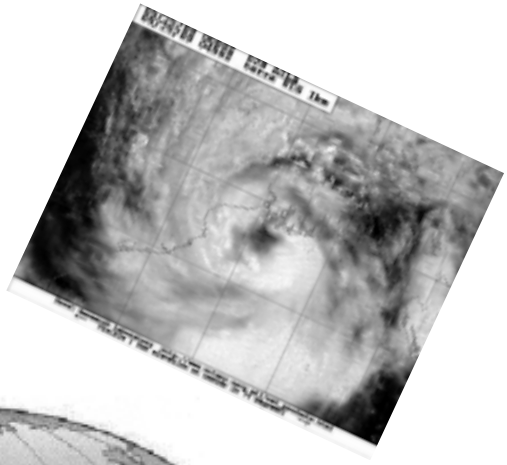

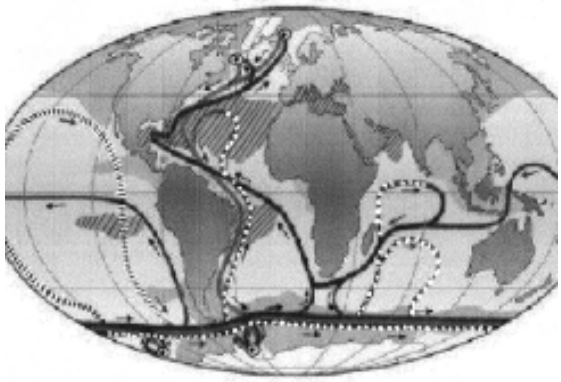

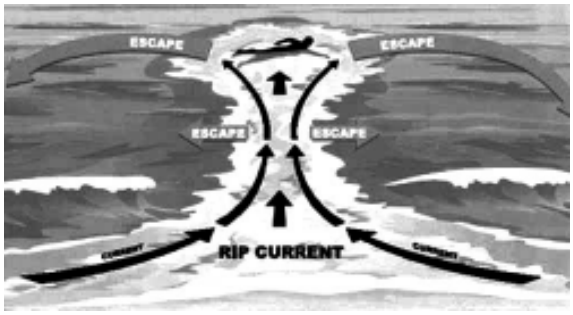

উৎস মানুষ

এপ্রিল-জুন ২০১২

সমুদ্র উপকূলের স্রোত

গৌতমকুমার সেন ও শরণ্যা চক্রবর্তী

সমুদ্র উপকূলের অদূরবর্তী অঞ্চল যেখানে ঢেউগুলি অনবরত ভেঙে পড়ছে, সেই অঞ্চলটিকে বলে 'সার্ফ অঞ্চল' [Surf Zone]। এই অঞ্চলে স্রোতের ব্যাপকতা নির্ভর করে ঢেউ এবং সমুদ্র তলদেশের আকারের ওপর। সাধারণত ঢেউ যতো বড়ো হবে, এই অঞ্চলের স্রোতও তত তীব্র হবে। এই অঞ্চলের স্রোতগুলিকে সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়:

১) আন্ডার টো স্রোত (Undertoe Current)

জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলে আমরা পায়ের তলায় যে স্রোত অনুভব করি। এটা সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে প্রবহমাণ সমুদ্র-অভিমুখী স্রোত।

২) দীঘলবেলা স্রোত (Alongshore current)

এটি উপকূলের সাথে সমান্তরাল দিকে গতিশীল হয়।

৩) অবারিত স্রোত (Rip Current)

উপকূল অঞ্চল থেকে সমুদ্র-অভিমুখী এবং সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়ে প্রবহমান অবারিত স্রোত।

মূলত এই তিন প্রকার স্রোতের দ্বারা উপকূলবর্তী সমুদ্রে স্নান করতে আসা ভ্রমণার্থীরা বিভিন্ন অসুবিধা ও বিপদের সম্মুখীন হয়ে থাকেন। উপরোক্ত তিন প্রকার স্রোত ছাড়াও আরও দুই প্রকার স্রোতের প্রভাব আমরা সবসময় দেখতে পাই, যথা:

১) জোয়ার-ভাঁটার ফলে সৃষ্ট স্রোত

২) বাতাসের দ্বারা প্রভাবিত স্রোত

কিন্তু এই দুই প্রকার স্রোত সাধারণত খুব তীব্র হয় না যদি না সমুদ্র উপকূলে কোনো ঝড়ঝঞ্ঝা উপস্থিত থাকে।

যখন সমুদ্রের ঢেউ উপকূলের দিকে এগিয়ে আসে তখন আমরা দেখতে পাই যে ঢেউ-এর উচ্চতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এই পদ্ধতিকে বলা হয় শোলিং (Shoaling) এবং তারা ক্রমান্বয়ে তাদের অভিমুখ এবং গতি পরিবর্তন করতে থাকে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'প্রতিসরণ' বা 'Refraction'। ঢেউ-এর চূড়াগুলি দূর থেকে লক্ষ্য করা গেলে দেখা যাবে যে, প্রথমাবস্থায় ঢেউগুলি উপকূলের সাথে সমান্তরালে থাকে না, বরং উপকূলের

সাথে একটি নির্দিষ্ট কোণ করে উপকূলের দিকে গতিশীল হয়। ক্রমান্বয়ে উপকূলের দিকে এটি যত এগোতে থাকে ততো উপকূলের সাথে সমান্তরাল হয় এবং অবশেষে ভেঙে পড়ে। সাধারণত যে স্থানে জলের গভীরতা ঢেউ-এর উচ্চতার দ্বিগুণ, সে স্থানে ঢেউ ভাঙে। ঢেউগুলি যত উপকূলের দিকে এগিয়ে আসে তারা ক্রমান্বয়ে ভেঙে পড়ে। কারণ দূর থেকে আসা ছোটো ঢেউগুলি সামনের দিকে ভাঙতে থাকে, যেহেতু উপকূলের দিকে ক্রমশঃ জলের গভীরতা হ্রাস পায়। সাধারণত বড়ো ঢেউগুলি উপকূল থেকে একটু দূরে ভাঙে এবং ছোট ঢেউগুলি উপকূলের কাছাকাছি অঞ্চলে এসে ভাঙে। যদি উপকূল সন্নিহিত অঞ্চলে জলের গভীরতা বেশি থাকে, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে সেই অঞ্চলে ছোট ঢেউগুলি ভাঙে না; এরা উপকূলের বালিয়াড়িতে এসে ধাক্কা মারে। এই ঘটনাটিকে যদি আমরা মনোযোগ সহকারে দেখি ও ঢেউ ভাঙার ধরনটিকে যদি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে উপকূল সন্নিহিত অঞ্চলে সমুদ্রতলদেশের বালুকাভূমির সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারি। এই ধারণার সাহায্যে আমরা উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রের অভিমুখী যে তিনটি স্রোতের দ্বারা পর্যটকদের বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, সেই বিষয়ে অবহিত করতে পারি।

১) **আন্ডার টো স্রোত**: এটি সমুদ্রতল দিয়ে প্রবহমান একপ্রকার সমুদ্র অভিমুখী স্রোত। এই স্রোতের প্রভাব অত্যন্ত বেশি হয় সমুদ্রতলের নিকটবর্তী অঞ্চলে। উপকূলের কাছে, উপকূলের দিকে এগিয়ে আসা কোনো বড় ঢেউ যখন ভাঙে, সেই ঢেউ ভাঙা জলের প্রভাবে সামনের দিকের উপকূলীয় অঞ্চলে জলতলের উচ্চতা সাধারণত বৃদ্ধি পায় না। যদি তা হত, তাহলে আমরা দেখতাম যে পরপর ধেয়ে আসা রাশি রাশি ঢেউ ভেঙে জলতলের উচ্চতা এতটা বৃদ্ধি পেত যে স্থলভাগের অধিকাংশ ঘরবাড়ি তার তলায় ডুবে যেত, কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। বাস্তবে, উপকূলের কাছে যখন কোনো বড় ঢেউ ভাঙে তখন সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে সমুদ্র অভিমুখে সৃষ্টি হয় আন্ডার টো কারেন্ট। এ ক্ষেত্রে ঢেউ ভেঙে বেরিয়ে আসা জলরাশি নিম্নমুখী হওয়ার চেষ্টা করে {অভিকর্ষজ বলের জন্য}। নিম্নমুখী প্রবাহ সমুদ্র তলদেশে পৌঁছানো মাত্র উপকূলের দিকে বাধার দরুণ পৌঁছতে পারে না। অতএব এটি মহাদেশীয় ঢাল অনুসরণ করে বিপরীত দিকে, অর্থাৎ সমুদ্র অভিমুখে গমনশীল হয়। এটিকেই বলা হয় **আন্ডার টো কারেন্ট**। উপকূলবর্তী অঞ্চলে মহাদেশীয় ঢালের খাড়াই বেশি হলে স্রোতের তীব্রতা বেশি হয় এবং খাড়াই কম থাকলে স্রোতের তীব্রতাও কম হয়।

সাধারণত বেশিরভাগ উপকূলবর্তী অঞ্চলে স্রোতের তীব্রতা খুব বেশি হয় না। কিন্তু যেসব অঞ্চলে মহাদেশীয় ঢাল অত্যন্ত বেশি সেসব অঞ্চলে উপকূলে স্নান করতে আসা পর্যটকদের কাছে এটি বিপদের কারণ হয়ে যায়। কারণ এই সময় কোনো বড় ঢেউ যদি কোনো পর্যটকদের উচ্চতার তুলনায় বেশি উঁচু হয়, তাহলে ওই ঢেউটি পর্যটকের মাথার ওপরে ভাঙে এবং ফলস্বরূপ নিম্নমুখী স্রোতের প্রভাবে ওই পর্যটক আরও নিচের দিকে ঢুকে যাবেন। কিন্তু পরপর যদি ঢেউ ভাঙতে থাকে তবে ওই পর্যটক ক্রমান্বয়ে সমুদ্রের তলদেশে চলে যেতে থাকবেন এবং অবশেষে তলিয়ে যাবেন। এই অবস্থায় আত্মরক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন এবং বেঁচে ফেরার সম্ভাবনাও খুবই ক্ষীণ। ঝড়ঝঞ্ঝার প্রভাবে সমুদ্র যখন বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে তখন জলোচ্ছ্বাস দেখা যায়। সেই সময় আন্ডার টো স্রোতের তীব্রতা খুব বেশি হয় এবং প্রচুর লোক মারা যান।

২) **দীঘলবেলা স্রোত [অথবা উপকূলের সমান্তরাল দীঘলবেলা স্রোত]**: যখন কোনো ঢেউ ভাঙার সময় উপকূলের সাথে লম্বালম্বি না থেকে অন্য যে কোনো কোণে আনত অবস্থায় উপকূলের অভিমুখে অগ্রসর হয়, তখন ঢেউ ভেঙে নির্গত জলরাশি উপকূলের সমান্তরাল দিকে অতি দ্রুত প্রবাহিত হতে থাকে। কিন্তু এই জলরাশির প্রভাবে সমুদ্রতলের দিকে নিম্নমুখী কোনো প্রবাহ সৃষ্টি হয় না। যদি কোনো পর্যটক এই স্রোতের মধ্যে পড়েন, তাহলে তার উপকূলের সমান্তরাল অভিমুখে ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ক্ষেত্রে কোনো কঠিন বস্তু [যেমন: গ্রয়েণ, জেটি ইত্যাদি] যদি ওই ব্যক্তির গতিপথে উপস্থিত থাকে তাহলে সেগুলির সাথে সংঘাতে ওই ব্যক্তির আহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩) **অবারিত স্রোত**: সাধারণত অবারিত স্রোত সৃষ্টি হতে গেলে উপকূলবর্তী অঞ্চলে অনেকগুলি 'বালিয়াড়ি' থাকতে হবে। পরপর দু'টি বালিয়াড়ির মধ্যবর্তী অঞ্চলের গভীরতা অধিক হয়। এই অবস্থায় যখন কোনো বড় ঢেউ উপকূলের সাথে লম্বভাবে প্রবাহিত হয়, তখন সেই ঢেউ দুপারের দুটি বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় দ্রুত ভেঙে যাবে এবং এই ঢেউ ভাঙা জলরাশি বালিয়াড়ি এবং উপকূলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটি নিম্নমুখী প্রবাহের সৃষ্টি করবে, যা সমুদ্রের অভিমুখী হয়। এই অঞ্চলের ঢাল বেশি হলে স্রোতের তীব্রতাও বেশি হবে। এই স্রোতকে বলে '*অবারিত স্রোত*'।

সাধারণত দেখা যায়, যেই সব অঞ্চলে উপকূল বরাবর ঢেউ ভাঙার ধরনের মধ্যে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়, সেই সব অঞ্চলেই এই সমস্ত স্রোত উৎপন্ন হয়। এ ক্ষেত্রে কোনো কোনো অঞ্চলে খুব বেশি তীব্রতার সাথে ঢেউ ভাঙছে এবং কোনো কোনো অঞ্চলে খুব কম তীব্রতার সাথে ঢেউ ভাঙছে। কারণ উপকূল সংলগ্ন অঞ্চলে সমুদ্রতলের গভীরতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই স্রোতের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট হল যে এটি একটি বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার পথে সঞ্চালিত হয় যাকে বলা হয় 'এডি'

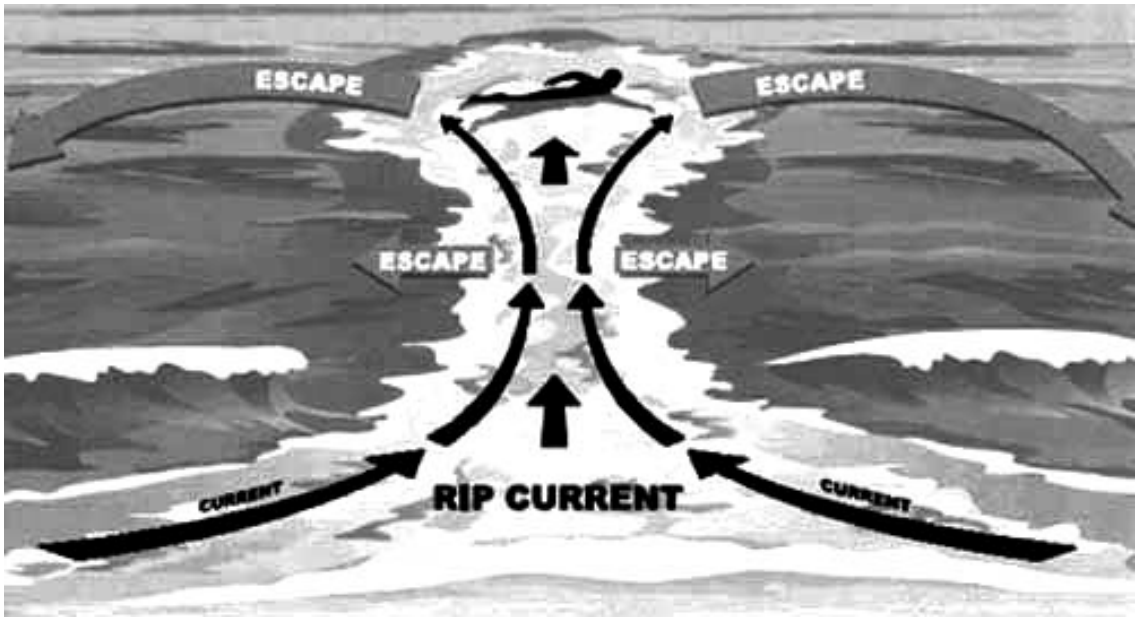

[Eddy]। এই স্রোত পরিমাপ করার জন্য সাধারণ স্রোত পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করা যায় না। তার জন্য সমুদ্রে ভাসমান একটি বিশেষ বস্তুর ওপর জি পি এস যন্ত্রটি লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই বিশেষ যন্ত্রটিকে বলা হয় ড্রিফ্‌টার [Drifter]। এই ড্রিফ্‌টার-কে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হয় যেখানে অবারিত স্রোত বর্তমান। এই স্রোতের টানে ড্রিফ্‌টার যখন চলতে থাকে, তখন একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর তড়িৎচুম্বকীয় প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে সময়, অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ পাঠাতে থাকে। উপকূলে রাখা গ্রাহক যন্ত্র এই তথ্য সংগ্রহ করে নথিবদ্ধ করে। এই সংগৃহীত অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশের নথি যদি কোনো রেখাচিত্রে পরপর বসানো হয়, তাহলে ওই বিন্দুগুলি পরপর বসিয়ে যদি একটি বৃত্ত বা উপবৃত্ত পাওয়া যায়; তাহলে সেটি যে একটি সমুদ্রমুখী 'অবারিত স্রোত' সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

অবারিত স্রোতের বেগ নির্ণয় করা যেতে পারে নিম্নলিখিত সূত্রটির সাহায্যে:

$$\text{অবারিত স্রোতের বেগ} = \frac{\text{রেখাচিত্র থেকে প্রাপ্ত পাশাপাশি দুটি বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব}}{\text{ওই দুটি বিন্দুর মধ্যে সময়ের পার্থক্য}}$$

অনেক সময় অবারিত স্রোতের বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার অঞ্চলটিকে বলা হয় 'এডি' [Eddy]। এই পথ অতিক্রম করতে প্রায় ৭-৮ মিনিট সময় লাগে। সমুদ্রমুখী আন্ডার টো স্রোত পরিমাপ করা তুলনামূলক ভাবে একটু শক্ত, তার জন্য বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়।

পর্যটকরা যদি অবারিত স্রোতের ফাঁদে পড়ে যান, তাহলে তারা কি করবেন?

১. স্রোতের সাথে লড়াই করার চেষ্টা করবেন না।

২. স্রোতের বিপরীতমুখে সাঁতার কাটার চেষ্টা করুন অর্থাৎ উপকূল অভিমুখে সাঁতার কাটার চেষ্টা করুন। এটি পুকুর বা ঝিলে সাঁতার কাটার মতো সহজ ব্যাপার নয়।

৩. যদি স্রোতের ফাঁদ থেকে বেরোতে না পারেন, তাহলে জলে ভেসে থাকার চেষ্টা করুন, যদিও এটি খুব সহজ কাজ নয়।

৪. যদি সাহায্যের দরকার হয় তাহলে চিৎকার করুন অথবা হাত নেড়ে সাহায্য প্রার্থনা করুন।

সুরক্ষিত থাকার উপায়:

১. সাঁতার না জানলে সমুদ্রের জলে স্নান করতে নামলে বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন।

২. কখনো একা সাঁতার কাটতে যাবেন না।

৩. সাঁতার না জানলে সমুদ্র তীরবর্তী বিপজ্জনক সীমা থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখুন।

অবারিত স্রোত (Rip Current) সম্বন্ধে আরও তথ্য জানতে হলে নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটগুলির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে: www.pipcurrents.noaa.gov/ www.usla.org

আমাদের বায়ুমণ্ডল ও আবহাওয়া চর্চা

অঞ্জন সেনশর্মা

বায়ুমণ্ডল কদাচিৎ নিথর। কখনও চলে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল, কখনও বা লম্বভাবে, তবে এর ঊর্ধ্বগতি সাধারণত অতি সামান্য, সেকেণ্ড কয়েক সেন্টিমিটার মাত্র, যেখানে সমান্তরাল গতি সেকেণ্ডে বেশ কয়েক মিটার পর্যন্ত হতে পারে, তবে বায়ুস্রোত মূলত সমান্তরাল—যাকে আমরা 'বাতাস' বলে অনুভব করি। তার উর্দ্ধগতি অমরা অনুভব করি না। তবু এই সামান্য উর্দ্ধগতি জলীয় বাষ্পকে সঙ্গে নিয়ে বায়ুমণ্ডলের অধিকাংশ ঘটনা ঘটায়।

একটি বিশাল বায়ু সমুদ্রের একদম তলায় আমাদের বাস, যাকে আমরা বায়ুমণ্ডল বলি। বেশ কয়েকটি গ্যাসের মিশ্রণ এই বায়ুমণ্ডল যাদের গড় অনুপাত পৃথিবীব্যাপী মোটামুটি একই থাকে, বিভিন্ন দূরত্বে, বিভিন্ন উচ্চতায় ও বিভিন্ন সময়ে। এর মূল উপাদান নাইট্রোজেন (৭৮%) এবং অক্সিজেন (২১%)। বাকি ১% বিভিন্ন গ্যাস। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন জায়গায় নানা ধরনের বস্তু এতে মিশে যায়। তার মধ্যে প্রধান হল জল। বাষ্প হয়ে নদী, সমুদ্র, হ্রদ বা যে কোনও জলাধার থেকে, এমন কি উদ্ভিদজগৎ থেকেও নিরন্তর বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় জল বায়ুমণ্ডলে আসে। জলীয় বাষ্প বাতাসের থেকে হাল্কা বলে ক্রমে ওপরে উঠতে থাকে, যতক্ষণ না ঠাণ্ডা হতে হতে তা আবার জলকণায় পরিণত হয়, দৃশ্যমান হয়, আমরা বলি মেঘ। এ ঘটনা মাটির ওপরেই ঘটে গেলে আমরা বলি কুয়াশা।

বায়ুমণ্ডল কদাচিৎ নিথর। কখনও চলে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল, কখনও বা লম্বভাবে, তবে এর ঊর্ধ্বগতি সাধারণত অতি সামান্য, সেকেণ্ড কয়েক সেন্টিমিটার মাত্র, যেখানে সমান্তরাল গতি সেকেণ্ডে বেশ কয়েক মিটার পর্যন্ত হতে পারে, তবে বায়ুস্রোত মূলত সমান্তরাল—যাকে আমরা 'বাতাস' বলে অনুভব করি। তার উর্দ্ধগতি অমরা অনুভব করি না। তবু এই সামান্য উর্দ্ধগতি জলীয় বাষ্পকে সঙ্গে নিয়ে বায়ুমণ্ডলের অধিকাংশ ঘটনা ঘটায়। কালবৈশাখীর রাজকীয় মেঘপুঞ্জ এর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। বিভিন্ন রকমের বিচিত্র সব ক্রিয়া-প্রক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ঘটনা-দুর্ঘটনা সতত চলতে থাকে বায়ুমণ্ডলের ভেতর যার অনেকটাই আমাদের অনুভূতির বাইরে। শুধু যে ঘটনাগুলো আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সেগুলোকেই আমরা আবহাওয়া (weather) বলে জানি। যেমন, তাপমান কুয়াশা, মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, বাতাসের বেগ ও গতিমুখ ইত্যাদি।

যে কোনও বস্তুর মতো বাতাসেরও ভর আছে। এই ভর মাটির ওপর একটা চাপ সৃষ্টি করে, প্রতিটি একক বর্গক্ষেত্রে তার পরিমাণকে বায়ুমণ্ডলের চাপ বলা হয়। এই চাপ পৃথিবীর প্রতি বিন্দুর সঙ্গে সব প্রাণীর দেহেও পড়ে। আমরা, মানুষেরাও—সবাই এই চাপের মধ্যে আছি, কিন্তু বুঝতে পারি না, কারণ আমরা এই চাপ নিয়ে আজন্ম লালিত হয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। মাটি ছেড়ে যত ওপরে ওঠা যায় বায়ুমণ্ডলের চাপ তত কমে কারণ যে অংশটা নিচে পড়ে আছে তার ভরটা বাদ পড়েছে। এই ধর্মটা তাই পর্বতারোহী ও বৈমানিকদের খুব কাজে লাগে। পৃথিবীপৃষ্ঠের সর্বত্র এই চাপ সমান নয়, কারণ চাপের তারতম্য অন্য কারণেও ঘটে, মূলত বিভিন্ন স্তরে তাপমানের আর খানিকটা আর্দ্রতার তারতম্যের কারণে। এই তারতম্য তাই পূর্বাভাষে কাজে লাগে।

সূর্য তার চারদিকে নিরন্তর শক্তি বিকিরণ করে চলেছে। তার যে অংশটা পৃথিবীর ওপর পড়ে তাতে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তপ্ত পৃথিবীও তাপ বিকিরণ করতে থাকে, তবে এ দুটি বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ আলাদা। সূর্যের বিকিরণ অনেক ছোট তরঙ্গদৈর্ঘের যা আমাদের বায়ুমণ্ডলকে অনায়াসে ভেদ করে আসে, কাচের জানলা দিয়ে, রোদের মতো। অন্যদিকে পৃথিবীর বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ অনেক বেশি যা বায়ুমণ্ডলকে অতিক্রম করতে

পারে না। বায়ুমণ্ডলেই শোষিত হয়ে যায় (কাচে ঘেরা ঘর যেভাবে গরম থাকে)। এর ফলে দুটো ব্যাপার ঘটে। প্রথমত পৃথিবীর তাপমান এমন একটি সীমার মধ্যে ধরা থাকে যা প্রাণের উন্মেষ সম্ভব করেছে। দ্বিতীয়ত, বায়ুমণ্ডলের তাপের উৎস পৃথিবী হওয়াতে উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস ঠাণ্ডা হতে থাকে (যে কারণে গ্রীষ্মে পাহাড়ী অঞ্চল আকর্ষক)। এই শীতল পরিবেশে তপ্ত হাওয়া এসে গেলে তাকে ক্রমান্বয়ে ওপরে উঠতে হয় কারণ গরম হাওয়া ঠাণ্ডা হাওয়ার থেকে হাল্কা। এর ফলে বায়ুদূষণ মাটির কাছে আবদ্ধ না থেকে ঊর্ধ্বাকাশে ছড়িয়ে গিয়ে তীব্রতা কমায়। উচ্চতার সঙ্গে ঠাণ্ডা হওয়াটা অবশ্য এক সময়ে থেমে যায়, আমাদের অঞ্চলে ১৮ কি মি-তে। আরও ওপরে তাপমান প্রায় অপরিবর্তিত থাকে বা উচ্চতার সঙ্গে অল্প অল্প বাড়তে থাকে। এই স্তরে বাতাসের উর্দ্ধগতি সম্ভব নয়। কারণ আগন্তুক হাওয়া চারপাশের হাওয়া থেকে ঠাণ্ডা ও ভারী হয়। তাই কোনো আহবহাওয়ার উৎপত্তিও সম্ভব হয় না। আমাদের আলোচনা তাই বায়ুমণ্ডলের এই (সবচেয়ে নীচের) স্তরে আবদ্ধ রাখলেই চলে। এই স্তর অতিক্রান্ত হলে বায়ুমণ্ডল আবার ঠাণ্ডা হতে থাকে। এ ভাবে বায়ুমণ্ডলকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যায়। তবে দুটি স্তরের কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করতেই হয়। একটি স্তরে ওজোন (Ozone 0_3) নামে একটি গ্যাসের (যেটি অক্সিজেনের একটি রূপ) আধিক্য আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক সব মহাজাগতিক রশ্মি থেকে রক্ষা করে। দ্বিতীয় স্তরটি একটি আয়নিত স্তর যেটি প্রাক্ উপগ্রহ যুগে পৃথিবীব্যাপী বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্ভব করেছিল। প্রথমটির গড় উচ্চতা ২৫ কি মি, দ্বিতীয়টির উচ্চতা বাড়ে কমে, তবে তা গড়ে ১০০ কি মি-র ওপরেই থাকে।

বায়ুমণ্ডল ঊর্ধাকাশে কত উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত? এর কোনো উত্তর নেই, কারণ বায়ুমণ্ডলের সত্যিই কোনো ঊর্ধসীমা টানা যায় না, ক্রমে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে একসময়ে মহাকাশের সঙ্গে মিশে যায়, কোনো ভেদরেখা নেই। বিজ্ঞানের এক একটি শাখা তাদের সুবিধে মত এক একটা কাল্পনিক ঊর্দ্ধসীমা ঠিক করে নিয়েছে। (যেমন আবহাওয়াবিদরা নিয়েছেন ৫০ কি মি উচ্চতাকে)।

তবে সূর্যের তাপ পৃথিবীর সর্বত্র সমানভাবে ছড়ায় না। নিরক্ষীয় অঞ্চল মেরু অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি উত্তপ্ত হয়। তাপের সমতা সাধনের প্রাকৃতিক প্রবণতায় নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে মেরুর দিকে তাপ সঞ্চালিত হয়। এ কাজটা মূলত করে বায়ুপ্রবাহ, বাকিটা করে সমুদ্রস্রোত। (সমুদ্র প্রবাহের সুদূরপ্রসারী ফল শ্রীযুক্ত সেনের পরবর্তী এক প্রবন্ধে)। নিরক্ষীয় অঞ্চলের তপ্ত বায়ু ওপরে ওঠে ও মেরুর দিকে বয়ে যায়। মেরু অঞ্চলের হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে নিচে নেমে আসে আর নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। এ সরল বিন্যাসে বিঘ্ন ঘটায় পৃথিবীর আহ্নিক গতি। যার ফলে বায়ু স্রোতের গতিমুখ কিঞ্চিৎ বিচ্যুত হয়ে যায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় নানা আঞ্চলিক প্রভাব, যেমন নিরক্ষীয় অঞ্চলের মৌসুমী বায়ু। সব মিলিয়ে দীর্ঘ সময়ের গড় নিলে একটা চিত্র ফুটে ওঠে যেটাতে বিভিন্ন মাত্রার বায়ু স্রোতের সম্মিলিত অভিমুখ—শক্তির সমবণ্টন। আর এই প্রবণতার ফলস্বরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বায়ুমণ্ডলের চাপের ও বায়ুস্রোতের বিন্যাস বিভিন্ন হয়ে যায়। এবং এ সব সদা পরিবর্তনশীল, সদা সচলও। বিভিন্ন কালসীমায় আবহাওয়ার ভবিষ্যৎ জানতে এদের বিবর্তনগুলো তাই জানা প্রয়োজন। আবহাওয়ার পূর্বাভাষের এটাই মূল প্রক্রিয়া।

পূর্বাভাষ প্রক্রিয়ার সূচনায় তাই সর্বাগ্রে জানা প্রয়োজন বায়ুমণ্ডলের প্রারম্ভিক পরিস্থিতি। মূলত তাপমান, আর্দ্রতা, চাপ ও বায়ুর গতিবেগ ও গতিমুখ। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি সংবেদনশীল সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির পর্যবেক্ষণ জাল এই কাজ নিরন্তর করে চলে। শুধু ভূপৃষ্ঠের পরিস্থিতিই নয়, বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতর স্তরেরও (এর বিশদ বিবরণ শ্রী ব্যানার্জী দিয়েছেন পরবর্তী প্রবন্ধে)। আর এ প্রচেষ্টা স্থানীয় বা আঞ্চলিক হতে পারে না। চলমান বায়ুস্রোত যেহেতু কোনও সীমা মানে না, তা সে রাজনৈতিকই হোক বা ভৌগোলিক, এ প্রচেষ্টা তাই দেশকালের সীমায় আবদ্ধ রাখা যায় না। সারা বিশ্বজুড়ে একই সঙ্গে এই কর্মকাণ্ড চালাতে হয়। বিশ্বজুড়ে ১০,০০০ (দশ হাজার)-এরও বেশি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (যার মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ও রয়েছে) প্রতিদিন পূর্বনির্ধারিত প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর সংগ্রহ করে যাচ্ছে ভূপৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলের পরিস্থিতি। ১,০০০ (এক হাজার)-এর বেশি কেন্দ্র দিনে ২ থেকে ৪ বার বিভিন্ন উচ্চতার বায়ুস্তরের চাপ, তাপ, আর্দ্রতা, বায়ুস্রোতের দিক ও বেগ মেপে যাচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের তথ্যাবলী সংগৃহীত হচ্ছে ৭,০০০ (সাত হাজার)-এরও বেশি জাহাজ, ১০০(একশো)-রও বেশি নোঙর করা ও ১০০০ (এক হাজার)-এরও বেশি স্রোতে ভেসে চলা বয়া থেকে। কয়েকশো আবহাওয়া রাডার ও ৩,০০০ (তিন হাজার)-এরও বেশি বিশেষভাবে সজ্জিত বিমান বায়ুমণ্ডলের ভূ ও সমুদ্রপৃষ্ঠের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বৈশিষ্ট্য মেপে যাচ্ছে প্রতিদিন। এর ওপর মহাকাশ থেকে নিরীক্ষণ করার জন্য রয়েছে ১৮ (আঠারো)টি ভূ-প্রদক্ষিণ রত ও ১৭ (সতেরো)টি ভূসমলয় কৃত্রিম উপগ্রহ। এ হিসেবের বাইরে রয়েছে ৩০ (ত্রিশ)টি পরিবেশ গবেষণা ও উন্নততর প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নিযুক্ত উপগ্রহ। তারপর এই সব সংগৃহীত তথ্য যাতে অবিলম্বে আঞ্চলিক পূর্বাভাষ কেন্দ্রে পৌঁছয় সে জন্য রয়েছে দ্রুততম যোগাযোগ ব্যবস্থা। (পূর্বাভাষ প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ শ্রী দেবনাথ তাঁর প্রবন্ধে দিয়েছেন)। সর্বোপরি রয়েছে তথ্য বিনিময় ব্যবস্থা। শুধু একটি দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক পূর্বাভাষ কেন্দ্রের মধ্যে নয়, প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গেও। এবং এভাবে এসব তথ্য অচিরেই বিশ্বময় ছড়িয়ে যাচ্ছে দ্রুততম যোগাযোগ

ব্যবস্থার সাহায্যে। আর এ সব প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধনের জন্য রয়েছে, রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিভূ হিসেবে, একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্ব আবহাওয়াবিজ্ঞান সংস্থা। (World Meteorological Organisation WMO)

সংগৃহীত তথ্যের এই বিপুল সম্ভারের কার্যকারিতা কিন্তু শুধু পূর্বাভাষ রচনায় ফুরিয়ে যায় না। পূর্বাভাষ রচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, অথচ বিভিন্নভাবে প্রয়োজনীয়, বায়ুমণ্ডলের এমন বহু তথ্যও প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। যেমন সূর্যালোকের স্থায়িত্ব, জলাধার ও উদ্ভিদজগত থেকে বাষ্পীভবনের পরিমাণ, ঘাসের উচ্চতার সর্বনিম্ন ও মাটির নিচে বিভিন্ন গভীরতার তাপমান, শিশিরের পরিমাণ ইত্যাদি। এসবই কৃষি পরিকল্পনায় জরুরি। বাষ্পীভবন জনিত অপচয়ের তথ্য জলসম্পদ বণ্টন ও সংরক্ষণের কাজে লাগে। সূর্য থেকে আহৃত শক্তির পরিমাপও প্রতিদিন করা হয় যা সৌরশক্তি চালিত বিদ্যুৎ প্রকল্প পরিকল্পনার জন্য অপরিহার্য। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপ নিয়মিত করা হয়—বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে ওজোন (Ozone) গ্যাসের পরিমাণ। এই গ্যাসটির গুরুত্ব আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। দশকের পর দশক ধরে আহরিত তথ্য ভাণ্ডার প্রয়োজন হয় যে কোনও নতুন প্রচেষ্টায়, তা সে নদীবাঁধ নির্মাণই হোক, কৃষি প্রকল্পই হোক বা বিমানবন্দর পত্তনই হোক। এই তথ্যপুঞ্জ আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি ও জলশক্তির হদিশ দেয়। প্রতিটি আবহাওয়া বিভাগের দায়িত্বের মধ্যে এই তথ্যের নির্ভুল সংগ্রহ ও সযত্ন সংরক্ষণ কাজটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

বায়ুমণ্ডল চর্চার উপযোগিতা উপলব্ধি করে কোনো দেশই এ চর্চা শুধু একটি বিভাগে আবদ্ধ রাখে নি, বিভিন্ন সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়েও ছড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের দেশেও শুধু আবহাওয়া গবেষণার দায়িত্ব দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান পত্তন করা হয় যার নাম 'নিরক্ষীয় আবহাওয়া বিজ্ঞান সংস্থা' (Institute of Tropical Meteorology)। পরে এই চর্চার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ভারতের 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন' (UGC) সব বিশ্ববিদ্যালয়কে বায়ুমণ্ডল বিজ্ঞান (Atmosphere Sciences) বিভাগ স্থাপনায় উৎসাহিত করেন । ফলস্বরূপ এখন প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু বিজ্ঞানী এ সংক্রান্ত গবেষণায় রত আছেন।

এই বিরাট কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও আবহাওয়ার নির্ভুল পূর্বাভাষ এখনও অধরা। তাই যদি কেউ মনে করেন আবহাওয়া জ্ঞান এখনও বিজ্ঞান পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে নি, তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। বিজ্ঞান পদবাচ্য হতে হলে যে শর্তগুলো পূরণ করা প্রয়োজন তার মধ্যে প্রধান দুটি শর্ত পদ্ধতিগত ও ব্যবহারিক। প্রথম শর্ত হল জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়াটি বৈজ্ঞানিক হওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয় শর্ত হল এই জ্ঞান ব্যবহার করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হল তা নির্ভুল হওয়া প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় এই দ্বিতীয় শর্ত পালনে আবহাওয়া জ্ঞান এখনও অক্ষম। বিজ্ঞানের এই অপারগতা ভরিয়ে দিতে নানা ধরনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে এবং হচ্ছে, যথা যন্ত্রগণক বা আবহাওয়া উপগ্রহ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যে-তিনটি মূল সমস্যা সমাধান করতে যন্ত্রগণকের প্রথম উদ্ভাবন তার একটি ছিল আবাহওয়ার পূর্বাভাষ। আর কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের প্রাথমিক প্রেরণা ছিল বিস্তীর্ণ সমুদ্র ও অনধিগম্য অঞ্চলের আবহাওয়া পরিস্থিতি যুগপৎ নিরীক্ষণ, যাতে পূর্বাভাষ সহজতর হয়। আধুনিক যুদ্ধের ব্যবহৃত অনেক মারণ প্রকৌশলও আবহাওয়া চর্চায় ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ দূরনিয়ন্ত্রিত চালকহীন বিমান (DRONE)। টর্নেডো বা সামুদ্রিক ঝড়ের অন্দরমহলের রহস্য জানার বিপজ্জনক ব্রতে এদের নিযুক্ত করা শুরু হয়েছে । (আবহমান কাল থেকে চলে আসা এই প্রচেষ্টার একটি রূপরেখা এ পর্যায়ের শেষ রচনায় শ্রীযুক্তা চৌধুরী দিয়েছেন)

এই বিরাট কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও আবহাওয়ার নির্ভুল পূর্বাভাষ এখনও অধরা। তাই যদি কেউ মনে করেন আবহাওয়া জ্ঞান এখনও বিজ্ঞান পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে নি, তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

আসলে পূর্বাভাষের অনিশ্চয়তা আবহাওয়া বিজ্ঞানের চরিত্রগত। এ বিজ্ঞান বিজ্ঞানের সেই গোষ্ঠীর অন্তর্গত যাদের সিদ্ধান্ত নিষ্পত্তিকর (Deterministic) হতে পারে না, শুধু সম্ভাবনাই বলতে পারে (Probabilistic)। (ব্যবহারিক অন্য আরেকটি অনুরূপ বিজ্ঞান—চিকিৎসাবিজ্ঞান)।

পূর্বাভাষের অনিশ্চয়তা থেকে উত্তরণের একটি পন্থা হিসেবে বায়ুমণ্ডল চর্চার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে "আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ"। বায়ুমণ্ডলের বিধ্বংসী রূপ যেমন—ঘূর্ণিঝড়, টর্নাডো, শিলাবৃষ্টি এমন কি অনাবৃষ্টি—যা থেকে প্রতি বছর প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয়, শুধু সম্পত্তি নয় জীবনেরও, সেগুলোকে প্রশমিত করার চেষ্টা অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে হয়ে চলেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু সুফল পাওয়াও গেছে। যথা, শিলাবৃষ্টি প্রশমন। অনেক ফসল শিলাবৃষ্টিতে প্রচণ্ড ক্ষতিতে পড়ে। কয়েকটি দেশ এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য সুফল পেয়েছে। কুয়াশায় অচল বিমানবন্দর থেকে কুয়াশা অপসারণের চেষ্টাতেও কয়েকটি দেশ অনেকাংশে সফল। একই প্রযুক্তি অন্যভাবে ব্যবহার করে অনাবৃষ্টি রোধ করার প্রচেষ্টা অবশ্য সর্বত্র সমান সাফল্য পায়নি।

'নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়া' তাই এখনও কল্পবিজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

উমা

জলবায়ুর ওপর সমুদ্রস্রোতের প্রভাব

বিবেক সেন

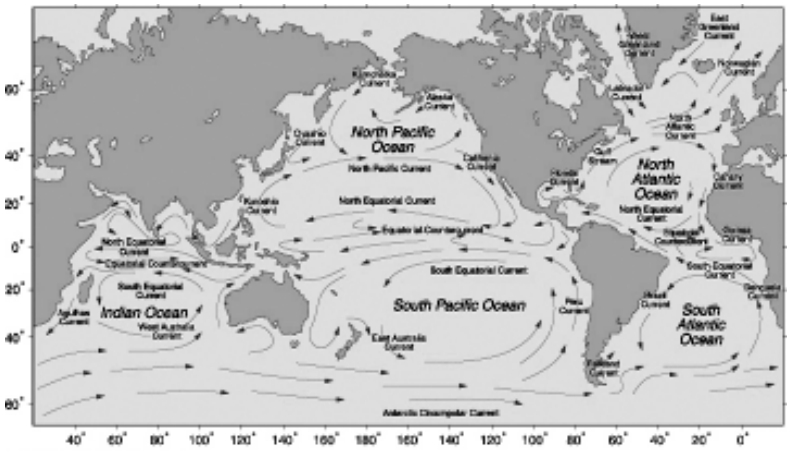

চিত্র নং ১

পৃথিবীর সমস্ত কর্মকাণ্ডে শক্তির জোগান আসে সূর্য থেকে। পৃথিবীপৃষ্ঠে যে পরিমাণ সৌরশক্তি এসে পৌঁছায় তার সিংহভাগ শোষণ করে নেয় সমুদ্রের জল, কারণ জলের এক বিশেষ গুণ। আর পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ ঢেকে আছে জল, মাত্র এক ভাগ স্থল। তাহলে বলা যেতেই পারে সাগর-মহাসাগরগুলি হল পৃথিবীতে সৌরশক্তির বা সৌরতাপের এক বিশাল ভাণ্ডার। বায়ুমণ্ডল এই মহাসাগরগুলি থেকে তাপ গ্রহণ করে উত্তপ্ত হয়। উত্তপ্ত বায়ুর চলন থেকে সৃষ্টি হয় বায়ুপ্রবাহ। বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রজলের ঘর্ষণে সৃষ্টি হয় সমুদ্রস্রোত। বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোত তাপ বহন করে নিয়ে যায় পৃথিবীর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় এবং সেখানকার আবহাওয়াকে করে প্রভাবিত।

এবার আবহাওয়ার উপর সমুদ্র ও সমুদ্রস্রোতের প্রভাবের আলোচনায় আসা যাক। সমুদ্র স্থলভাগের চেয়ে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়। আবার শীতল হতেও সময় নেয় বেশি, ফলে সমুদ্র ও উপকূলবর্তী স্থলভাগের মধ্যে শীতল অঞ্চল থেকে উষ্ণ অঞ্চলের দিকে একটা স্থানীয় বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। ভূপৃষ্ঠে বায়ু শীতল অঞ্চল থেকে উষ্ণ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়ে সেখানে ঊর্ধমুখী হয় এবং এই উষ্ণ অঞ্চল থেকে বায়ু প্রবাহিত হয়ে শীতল অঞ্চলে নেমে আসে। এর ফলে সমুদ্রতীরের স্থলভাগের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য কিছুটা কম হয়। তেমনি সমুদ্র শীতল হতে বেশি সময় নেয় বলে গ্রীষ্মের পর শীতকালে সমুদ্রের তাপমাত্রা স্থলভাগের চেয়ে বেশি থাকে। তাই সমুদ্র থেকে দূরবর্তী স্থলভাগের চেয়ে উপকূল অ—চল অপেক্ষাকৃত উষ্ণ থাকে। পৃথিবীর সব দেশেই এটা সমভাবে প্রযোজ্য। সমুদ্রস্রোতের প্রভাব কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন। কারণ কোনও অঞ্চলের পাশ দিয়ে হয়ত প্রবাহিত হচ্ছে উষ্ণ স্রোত, কোনও অঞ্চলের পাশ দিয়ে শীতল স্রোত। আমাদের আলোচনার মুখ্য বিষয় আবহাওয়ার উপর সমুদ্রস্রোতের প্রভাব।

সমুদ্রস্রোতের গতিপথের একটা মানচিত্র (চিত্র নং ১) সামনে থাকলে সহজেই বোঝা যাবে কোন একটি দেশের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া স্রোতটি সে দেশের উপর কি ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে। নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে আসা উষ্ণ স্রোত যে সেই অঞ্চলের বায়ুর তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেবে, আর মেরু অঞ্চল থেকে আসা শীতল স্রোত তাপমাত্রা কমিয়ে দেবে সেটা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। মানচিত্রটিতে সমুদ্রস্রোতের গতিমুখ ও তাদের নাম দেখান আছে, তাই এখানে আর পুনরুল্লেখ করা হল না।

মানচিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে স্রোতগুলি দুটি মহাদেশের মধ্যে বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার পথে প্রবাহিত হচ্ছে। উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে স্রোতের পথ প্রায় বৃত্তাকার। সমুদ্রবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন মহাদেশ দুটির উপকূল থেকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে বৃত্তাকার পথটির প্রায় কেন্দ্রস্থলে সর্বোচ্চ হয়েছে। ফলে মধ্য মহাসাগরে সমুদ্রজলের একটি স্তূপ গড়ে উঠেছে। জলের ধর্ম অনুযায়ী সমুদ্রপৃষ্ঠের সর্বত্র জলের উচ্চতা একই থাকা উচিত। কেন এই ব্যতিক্রম তার একটা ব্যাখ্যা আমরা পেয়েছি নরওয়ের বিজ্ঞানী ভি ওয়ালফ্রিড একম্যান-এর কাছ থেকে। তিনি দেখিয়েছেন দুই মেরুর সংযোগকারী অক্ষরেখাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর ঘূর্ণন অর্থাৎ আহ্নিক গতির ফলে স্রোতটির সঙ্গে লম্বভাবে সমুদ্রজল সরে যায়—উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বাঁদিকে। সমুদ্রজলের এই বিচ্যুতিকে একম্যান সরণ বলা হয়েছে। এই সরণের ফলে চতুর্দিক থেকে জল কেন্দ্রের দিকে সরে আসায় পূর্বোক্ত স্তূপ গড়ে ওঠে। পরবর্তী আলোচনায় এই সরণের কথা আবারও উল্লেখ করতে হবে। জলের এই স্তূপ ও তার চতুর্দিকে স্রোতের আবর্তনকে বিজ্ঞানীরা Gyre বলে থাকেন। প্রত্যেক মহাসাগরে এই রকম এক একটা Gyre আছে।

স্রোতের গতিপথ ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে

স্রোতগুলি যেন একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে প্রবাহিত হচ্ছে। যেমন উত্তর গোলার্ধে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে বিষুবরেখা থেকে ৪০° অক্ষাংশের মধ্যে প্রায় বৃত্তাকারে বয়ে চলেছে আর দক্ষিণ গোলার্ধে ১০° অক্ষাংশ ও ৫০° অক্ষাংশের মধ্যে—তবে উত্তরে ঘড়ির কাঁটার দিক অনুসরণ করে, আর দক্ষিণে তার উল্টোদিকে। কারণ বায়ুপ্রবাহ উপরোক্ত অঞ্চলগুলিতে এই রকম দিক অনুসরণ করেই প্রবাহিত হয়ে থাকে, আর আগেই বলা হয়েছে যে সমুদ্রস্রোত সৃষ্টি হয় বায়ুপ্রবাহের শক্তি দ্বারা। বায়ুপ্রবাহের এই অঞ্চলগুলিতে এমন বৃত্তাকার গতিপথ হওয়ার কারণ আবহাওয়া বিজ্ঞানের অন্তর্গত, সেটা আমাদের আলোচনার বাইরে। এইটুকু মনে রাখলেই হবে যে, বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টির জন্য বায়ুমণ্ডলকে সমুদ্র থেকে শক্তি আহরণ করতে হয়েছিল। আবার বায়ুপ্রবাহ এবং সমুদ্রজলের ঘর্ষণের ফলে সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি।

সমুদ্রস্রোতগুলি মহাসাগরের অন্তর্গত হয়েও তাদের একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে যার সাহায্যে এদের চিহ্নিত করা যায়। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের কুরেশীয় স্রোত চীন ও জাপানের পূর্ব উপকূল বরাবর প্রবাহিত হচ্ছে; উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবাহিত হচ্ছে গালফ্ স্ট্রীম (উপসাগরীয় স্রোত)। এই দুটো স্রোতেরই গতিবেগ অন্যান্য স্রোতগুলি থেকে বেশি—ঘণ্টায় ৯ কি মি-র কাছাকাছি। এরা প্রস্থে কম (৮০ কি মি থেকে ১৫০ কি মি), কিন্তু গভীরতায় অন্যদের ছাড়িয়ে যায় (৮০০ মি থেকে ১২০০ মি)। সমুদ্রজল পরিবহন করার ক্ষমতাও অনেক বেশি—যেমন উপসাগরীয় স্রোত বহন করে সেকেন্ডে ৫৫ মিলিয়ন ঘন মিটার ও কুরেশীয় স্রোত করে সেকেন্ডে ৬৫ মিলিয়ন ঘন মিটার জল। অথচ এই দুটি মহাসাগরেরই পূর্বপ্রান্তে উত্তর আমেরিকা এবং আফ্রিকা মহাদেশ দুটির পশ্চিম উপকূল বরাবর দক্ষিণমুখী ক্যালিফোর্নিয়া ও ক্যানারি স্রোত গভীরতায় কম কিন্তু অনেক বেশি প্রশস্ত—প্রায় ১০০০ কি মি। এদের গতিবেগ ঘণ্টায় মাত্র ১ কি মি-র কাছাকাছি। এদের বহন করার ক্ষমতা যথাক্রমে ১০ ও ১৬ মিলিয়ন ঘন মিটার জল। তবে দক্ষিণ মেরুতে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশটি প্রদক্ষিণ করে সর্বত্র পশ্চিম থেকে পূর্বমুখী যে স্রোতটি প্রবাহিত হচ্ছে তার কাছে সব স্রোতকে হার মানতে হয়। এর গতিবেগ যেমনি বেশি তেমনি জল বহন করার ক্ষমতায় পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী। এটি সেকেন্ডে ১২৫-১৩৫ মিলিয়ন ঘন মিটার জল বহন করে থাকে।

মানচিত্রে দেখানো স্রোতগুলি সমুদ্রের উপরিভাগে দেখা যায়—গভীরতা ৩০০ থেকে ৪০০ মিটারের বেশি নয়। তাই এগুলিকে সমুদ্রপৃষ্ঠ স্রোত বলা যেতে পারে। ভূগোলের ছাত্রদের কাছে এগুলি অপরিচিত নয়। কিন্তু সমুদ্রপৃষ্ঠ স্রোত ছাড়াও সমুদ্রবিজ্ঞানীরা এমন সব তথ্য আবিষ্কার করেছেন যেগুলি সাধারণ মানুষের কাছেও চিত্তাকর্ষক মনে হতে পারে। এই রকম গুটি কয়েক তথ্য পাঠকের সামনে তুলে ধরা যাক।

বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানী চোখে ধরা পড়েছে বেশ কিছু বিস্ময়কর তথ্য সমুদ্রের গহীন জলে—অর্থাৎ অনেক গভীরে, দুর্গম জলে। তাঁরা দেখেছেন ৫৫° উত্তর অক্ষাংশের কাছে উত্তর আটলান্টিক স্রোতের লবণাক্ত ও শীতল ভারী জল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে নিম্নমুখী হয়ে পাতালে প্রবেশ করছে। আবার উত্তর থেকে আসা মেরু অঞ্চলের শীতল নরওয়েজিয়ান স্রোতের ভারী জল ৭০° অক্ষাংশের কাছে নিম্নমুখী হয়েছে। এখানে সমুদ্রজলের নিম্নমুখী হওয়ার আর একটি কারণ হল উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক থেকে আসা কয়েকটি স্রোত একত্র মিলিত হওয়া। এই স্রোতগুলি দ্বারা বাহিত হয়ে অতিরিক্ত জলকে নিম্নমুখী হতে বাধ্য করে। এই অঞ্চলে সমুদ্রের তলদেশের একটি দীর্ঘ ফাটল গ্রীনল্যান্ড, আইসল্যান্ড ও গ্রেট ব্রিটেনকে যুক্ত করেছে। এই ফাটলটি ধরে নিম্নমুখী জলের স্রোতটি সমুদ্রের গভীরে প্রবেশ করে দক্ষিণদিকে নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে (চিত্র নং ২)। এই গহীন সমুদ্রস্রোতটিকে নর্থ আটলান্টিক ডিপ ওয়াটার বলা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সমুদ্রপৃষ্ঠ স্রোতের গহীন সমুদ্রে প্রবেশ করার প্রক্রিয়াটিকে ডাউনওয়েলিং (অধোগমন) বলা হয়। অন্যদিকে একম্যান সরণের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের জল অপসারিত হলে সমুদ্রের গহীন জল উৎসারিত হয়ে সেই স্থান দখল করে। এই প্রক্রিয়াটিকে আপওয়েলিং (উৎসারণ) বলা হয়।

উত্তর মহাসাগরের পরে সমুদ্রজল অধোগমনের আর একটি প্রধান অঞ্চল হল অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ সংলগ্ন ওয়েডেল সাগর ও রস সাগর। ৬০° দক্ষিণ অক্ষাংশ বরাবর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে একটা প্রবল বায়ুপ্রবাহ অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশটি প্রদক্ষিণ করে বয়ে চলেছে (১নং চিত্র)। এর প্রভাবে প্রচুর সমুদ্রজল বাষ্পীভূত হয় ও সমুদ্রকে অত্যন্ত শীতল করে তোলে। কারণ বাষ্পীভবনের প্রয়োজনীয় তাপ বায়ু সমুদ্র থেকেই আহরণ করে। এই অঞ্চলের সমুদ্রজল যেমন শীতল তেমনি আবার অত্যন্ত লবণাক্ত। লবণের ঘনত্ব বেশি হলে জল বেশি ভারী হয়ে ওঠে। ভারী জল অপেক্ষাকৃত কম ভারী জলের দিকে প্রবাহিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট পাতাল প্রবাহকে তাপমান-লবণতা চালিত প্রবাহ (Thermo-haline circulation) বলা হয়। গহীন সমুদ্রস্রোতকে সমুদ্রপৃষ্ঠ স্রোতের বিপরীতে সমুদ্রতল প্রবাহ বললে আশা করি ভুল হবে না। অ্যান্টার্কটিকার কাছে দক্ষিণ মহাসাগরে সৃষ্ট পাতালপ্রবাহ Antartic Bottom Water (AABW) সংসারে সব চেয়ে ভারী সমুদ্রতল প্রবাহ।

সমুদ্রপৃষ্ঠ স্রোত একটা গোলার্ধ থেকে অন্য গোলার্ধে প্রবেশ করতে পারে না, কিন্তু সমুদ্রতল প্রবাহের সেই বাধা নেই। সমুদ্রতল প্রবাহের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হল এটা কখনও সমুদ্রতল স্রোত রূপে কখনও বা উৎসারণের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠ স্রোত রূপে প্রবাহিত

হয়। সমুদ্রতল স্রোতের উৎসারণ হয় প্রধানত অ্যান্টার্কটিকার দক্ষিণ সাগরে। উৎসারণের অন্যান্য উৎসস্থল হল উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে ও ভারত মহাসাগরে। কিন্তু এই দুটি মহাসাগরে উৎসারণ এত ধীরে ধীরে ও বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে হয় যে কোনও একটা বিশেষ অঞ্চলকে চিহ্নিত করা যায় না। সমুদ্রপৃষ্ঠ ও সমুদ্রতল প্রবাহ মিলে সমস্ত মহাসাগরগুলিকে জুড়ে একটা অবিচ্ছিন্ন স্রোতের শৃঙ্খল গড়ে উঠেছে (চিত্র নং ২)। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন Global oceanic conveyer belt (GOC) বা Meridional overturning circulation (MOC) ।

স্রোতটি একবার সমুদ্রতলে অধোগমন ও আবার সমুদ্রপৃষ্ঠে উৎসারণ করে প্রবাহিত হচ্ছে বলে দ্বিতীয় নামটি রাখা হয়েছে। অ্যান্টার্কটিকা সন্নিহিত সাগরের একটা বিশেষ গভীরতায় সমস্ত মহাসাগরের স্রোতগুলি মিলিত হয়ে একটা অতিকায় আবর্ত (supergyre) সৃষ্টি করেছে। এর মিশ্রিত জল MOC দ্বারা প্রবাহিত হয়ে সমস্ত মহাসাগরে তাপশক্তিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। ২০০৫ সালে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে অধোগমনের পর অ্যান্টার্কটিকা হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে উৎসারণ হতে তার সময় লেগেছে প্রায় ১৬০০ বছর।

উষ্ণ জল শীতল জলের চেয়ে দ্রুত বাষ্পীভূত হয়। আর উষ্ণ বায়ুর জলীয় বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতাও বেশি। তাই উষ্ণ সমুদ্রের ওপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু স্থলভাগের ওপর তাপ ও প্রচুর জলীয় বাষ্প দুই-ই বহন করে আনে। শীতল বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে। বায়ুর উপরোক্ত ধর্মকে মনে রেখে পৃথিবীর কয়েকটি অঞ্চলে আবহাওয়ার উপর সমুদ্রেস্রোতের প্রভাব নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা হল।

(১) প্রথমে ভারতবর্ষ ও তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর কথাই ধরা যাক। আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের অধিকাংশ ভাগই উত্তর ভারতে পাওয়া যায় জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত আর দক্ষিণ ভারতে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে। কারণ জুন মাসের প্রথম দিকে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে আসা নিরক্ষীয় অঞ্চলের উষ্ণ বায়ু প্রচুর জলীয় বাষ্প নিয়ে এই অঞ্চলে প্রবেশ করে। সেই সঙ্গে সমুদ্রস্রোতও তার অভিমুখ পরিবর্তন করে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী হাওয়া উত্তর ভারতের পশ্চিম প্রান্ত অবধি ধাওয়া করে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকাকে শস্য-শ্যামলা করে তোলে।

সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী হাওয়া পিছু হটা শুরু করে ও অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ উত্তর ভারত এর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়। কিন্তু উষ্ণ ও জলীয় বাষ্পপূর্ণ নিরক্ষীয় হাওয়ার আনাগোনা দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে তখনও বজায় থাকে। তবে ততদিনে ভারতের স্থলভাগ শীতল হয়ে ওঠায় সেখানে সৃষ্টি হয় উচ্চচাপ অঞ্চল যার প্রভাবে বঙ্গোপসাগরের উপরে বায়ুপ্রবাহ বয় উত্তর-পূর্ব দিক থেকে। তাই এই বায়ুপ্রবাহকে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী হাওয়া বলা হয়ে থাকে। সমুদ্রস্রোতের অভিমুখও অনুরূপভাবে পরিবর্তিত হয়। উত্তর-পূর্ব মৌসুমী হাওয়া বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে দক্ষিণ ভারতের পূর্ব উপকূলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। সামুদ্রিক ঝড় সৃষ্টির জন্য সমুদ্রজল যথেষ্ট উষ্ণ হওয়া প্রয়োজন, তাপমাত্রা অন্তত ২৭° সে হওয়া চাই। উষ্ণ জলে নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ার পর যদি দেশের স্থলভাগে প্রবেশ করার আগে অনেকটা সমুদ্রপথ অতিক্রম করতে হয় তবে সেটা ক্রমাগত জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ পায়। শক্তিশালী নিম্নচাপের সঙ্গী হাওয়া যদি ঘণ্টায় ৬২ কি মি ছাড়িয়ে যায় তবে সে রকম নিম্নচাপকে সামুদ্রিক ঝড় বলা হয়ে থাকে। উত্তর ভারত মহাসাগরে অর্থাৎ আমাদের অঞ্চলে সামুদ্রিক ঝড়কে আমরা সাইক্লোন বলে থাকি। (উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে এর নাম টাইফুন, উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে হারিকেন)। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত (এবং অনুরূপ কারণে এপ্রিল/মে মাস) বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরে সামুদ্রিক ঝড় সৃষ্টি হওয়ার উপযুক্ত সময়।

(২) ১নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে উষ্ণ নিরক্ষীয় স্রোত মেক্সিকো উপসাগর ও গাল্ফ প্রণালী হয়ে উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূল বরাবর উপসাগরীয় স্রোত (গাল্ফ স্ট্রীম) নামে উত্তর দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। এই উষ্ণ স্রোতটি ফ্লোরিডা থেকে নিউ ফাউন্ডল্যান্ড পর্যন্ত প্রভাব ফেলেছে। স্রোতটির ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া পশ্চিমমুখী বাতাস উত্তর আমেরিকার অভ্যন্তরীণ অঞ্চলেও শীতের তীব্রতা কমিয়ে দেয়, উপকূল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় ২০০-৩০০ সে মি আর অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে ১০০-২০০ সে মি। এই উষ্ণ স্রোতের একটি শাখা পূর্বমুখী হয়ে উত্তর আটলান্টিক স্রোত নামে আয়ার্ল্যান্ড ও গ্রেট ব্রিটেনে পৌঁছায়। সেই জন্য এই পশ্চিম উপকূলের তাপমাত্রা পূর্ব উপকূলের থেকে দু-এক ডিগ্রি বেশি থাকে। উত্তর আটলান্টিক স্রোতের আর একটি শাখা উত্তরমুখী হয়ে নরওয়ের পশ্চিম উপকূল দিয়ে প্রবাহিত হয়। ফলে মেরু সন্নিহিত এই দেশটি শীতকালে বরফাবৃত হলেও পশ্চিম উপকূলটি সারা বছরই বরফমুক্ত থাকে। এটা সম্ভব হয়েছে এই উষ্ণ সমুদ্রস্রোত ও তার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বায়ুপ্রবাহের জন্য।

উপসাগরীয় স্রোতের উষ্ণতা সামুদ্রিক ঝড় হারিকেনের উৎপত্তি ও তার তীব্রতা বৃদ্ধির সহায়ক। আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের অঞ্চলগুলি প্রায় প্রতি বছরই হারিকেনের শিকার হয়ে থাকে। নিরক্ষীয় স্রোতে অঙ্কুরিত হয়ে এগুলি প্রথমে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয় ও ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। ক্যারিবিয়ান সাগর হয়ে এটি উত্তর-পশ্চিমমুখী ও পরে উত্তরমুখী হয়ে উপসাগরীয় স্রোত ধরে আমেরিকার পূর্ব উপকূলে পৌঁছায়। তখন এর তীব্রতা হারিকেনের স্তরে পৌঁছে যায়।

(৩) উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের আবহাওয়া পূর্ব উপকূলের বিপরীত। প্রশান্ত মহাসাগরের নিরক্ষীয় উষ্ণ স্রোত এশিয়ার পূর্ব উপকূল বরাবর উত্তর দিকে কুরেশীয় স্রোত নামে প্রবাহিত হচ্ছে। ৫০° অক্ষাংশের কাছাকাছি এসে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত নামে এটি প্রবাহিত হয়েছে পূর্ব দিকে। তার আগে উত্তর থেকে শীতল কামচাট্স্কা স্রোত এসে মিলেছে এর সঙ্গে। আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে এই মিলিত শীতল স্রোত চলেছে দক্ষিণ দিকে—যার নামকরণ হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত। একম্যান সরণের ফলে উৎসারিত শীতল গহীন জল এই স্রোতের তাপমাত্রা আরও কমিয়ে দিচ্ছে। ফলে পশ্চিম উপকূলের তাপমাত্রা যেমন কম থাকে তেমনি বৃষ্টিপাতও হয় পূর্ব উপকূলের চেয়ে কম। বরং এই শীতল স্রোতের প্রভাবে অঞ্চলটি ঢাকা থাকে ঘন কুয়াশায়। সমুদ্র শীতল হওয়ার দরুণ উপকূলটি সামুদ্রিক ঝড়ের আশঙ্কা থেকে মুক্ত।

(৪) প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম প্রান্তে এশিয়া মহাদেশের পাশ দিয়ে প্রবাহিত উষ্ণ কুরেশীয় স্রোত চীন ও জাপানের তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলের সন্নিহিত উপসাগরীয় স্রোতের মতো কুরেশীয় স্রোতেও সৃষ্টি হয় বিধ্বংসী সামুদ্রিক ঝড় টাইফুন—আঘাত করে চীন বা জাপানের উপকূল ভাগে। অন্য দিকে একটু আগেই বলা হয়েছে যে এই মহাসাগরের পূর্ব প্রান্তে শীতল ক্যালিফের্নিয়া স্রোতের প্রভাবে উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল সামুদ্রিক ঝড়ের আশঙ্কা থেকে মুক্ত।

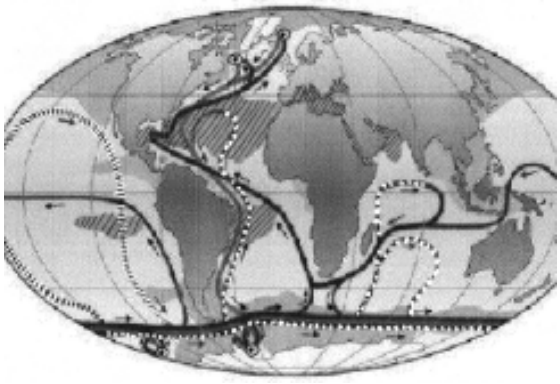

চিত্র নং ২

(৫) উত্তর গোলার্ধে আবহাওয়ার ওপর সমুদ্রস্রোতের প্রভাবের আর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল লাব্রাডর স্রোত। এটির উৎপত্তি উত্তর মেরুর সন্নিহিত আর্কটিক সাগরে। এর হিমশীতল জল যখন বাফিন দ্বীপপুঞ্জের উপকূল দিয়ে এসে আটলান্টিক মহাসাগরের উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের সঙ্গে মেশে, তখন সেখানে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সৃষ্ট হয় ঘন কুয়াশা। সেই সঙ্গে আর্কটিক সাগর থেকে ভেসে আসে বিশাল আকারের হিমশৈল। ফলে এই পথ দিয়ে চলাচলকারী জাহাজগুলি সম্মুখীন হয় এক বিষম সঙ্কটের মুখে।

(৬) দক্ষিণ গোলার্ধে অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল দিয়ে প্রবাহিত অস্ট্রেলিয় স্রোতটি নিরক্ষীয় স্রোতের একটি শাখা। এই উষ্ণ স্রোতটি পূর্ব উপকূলের তাপমাত্রা দেয় বাড়িয়ে, বৃষ্টিপাতও হয় ভাল। এই উষ্ণ জলে সামুদ্রিক ঝড়েরও সৃষ্টি হয়ে থাকে। পশ্চিম উপকূল দিয়ে বয়ে যাওয়া অস্ট্রেলিয় স্রোতটি অ্যান্টার্কটিকা পরিক্রমাকারী শীতল স্রোতেরই একটি শাখা। তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পূর্ব উপকূলের তুলনায় অনেক কম। দক্ষিণ-পশ্চিমের কিছুটা অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হলেও বাকি পশ্চিম উপকূল প্রায় মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে।

(৭) আফ্রিকার পূর্ব উপকূল দিয়ে প্রবাহিত দক্ষিণমুখী নিরক্ষীয় স্রোতের প্রভাবে উপকূলটির আবহাওয়া উষ্ণ ও আর্দ্র। অন্যদিকে পশ্চিম উপকূলে বয়ে চলেছে শীতল বেংগুয়েলা স্রোত দক্ষিণ থেকে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া ও অ্যাংগোলা রাষ্ট্রের পাশ দিয়ে। এর উৎস অ্যান্টার্কটিকা পরিক্রমাকারী অত্যন্ত শীতল সমুদ্রপৃষ্ঠ স্রোত। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একম্যান সরণের ফলে উৎসারিত শীতল সমুদ্রতল জল। সেই জন্যে বছরের অধিকাংশ সময় অঞ্চলটি ঘন কুয়াশায় ঢাকা থাকে। নামিবিয়া উপকূলের উত্তরাংশে কুয়াশার দরুণ অনেক জাহাজডুবির ঘটনা হয়েছে। আজও এখানে অনেক ছোট বড় জাহাজের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। তাই নামিবিয়ার উত্তর উপকূলকে স্কেলিটন কোস্ট নাম দেওয়া হয়েছে। আবার শীতল জলের সংস্পর্শে আসা শীতল বায়ুতে জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা কম হওয়ার দরুণ বৃষ্টিপাতও হয় সামান্য। ফলে নামিবিয়ার অভ্যন্তরীণ অঞ্চল পরিণত হয়েছে মরুভূমিতে।

(৮) দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর দিয়ে দক্ষিণ নিরক্ষীয় উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত হওয়ায় বার্ষক বৃষ্টিপাত হয় ২০০ থেকে ৩০০ সে মি পর্যন্ত—উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তারও বেশি। এই উষ্ণ স্রোতটির একটি শাখা ব্রাজিল স্রোত নামে দক্ষিণ দিকে দেশটির পূর্ব উপকূল ধরে প্রবাহিত। এর প্রভাবে পূর্ব উপকূল ও তার অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে ১০০-২০০ সে মি।

মহাদেশটির আর একটি উল্লেখযোগ্য স্রোত হল পেরু বা হামবোল্ট স্রোত। এটিরও উৎস অ্যান্টার্কটিকা পরিক্রমাকারী স্রোত। এরই একটি শাখা প্রবাহিত হয় দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল বরাবর দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে। এই শীতল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত হয় পেরুর কাছে সমুদ্রতল থেকে উৎসারিত শীতল জল। এর ফলে আফ্রিকার নামিবিয়ার মতো একই কারণে উত্তর চিলি ও পেরুর সমুদ্র উপকূলের অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত

হয়েছে। উত্তর চিলির বন্দর শহর আরিকাতে বার্ষিক বৃষ্টিপাত হয় মাত্র ০.৭৬ মি মি। কিন্তু চিলির দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের ওপর দিয়ে জলীয় বাষ্পপূর্ণ পশ্চিমা বায়ু আন্ডিজ পর্বতমালায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়।

(৯) পেরু স্রোত সহ উপরে বর্ণিত অন্যান্য সমুদ্রপৃষ্ঠ স্রোতগুলির প্রভাব কেবলমাত্র তাদের সন্নিহিত দেশগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু পেরু স্রোতটির গুরুত্ব আরও বেশি। পেরুর নাবিকেরা তাদের দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত। তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে কোন কোন বছরে এই আবহাওয়ার এক অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয়। শীতল সমুদ্রের জল হয়ে ওঠে উষ্ণতর। শুষ্ক আবহাওয়ার পরিবর্তে আসে ভারি বর্ষা—কখনও বা বজ্র সহ। মাছ ধরা তাদের প্রধান পেশা। কিন্তু এই উষ্ণ সমুদ্রে মৎস্যকুল যেন উধাও। সমুদ্রের এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিকে স্পেনীয় ভাষায় তারা চিহ্নিত করলেন 'এল নিনো' নামে। আবার কোনও কোনও বছর এমন হল যখন সমুদ্র স্বাভাবিকের চেয়েও শীতল, বায়ু যেন আরও রুক্ষ; ছিঁটে-ফোঁটা যেটুকু বৃষ্টি হত তারও দেখা নেই। এই বিপরীত পরিস্থিতির নাম রাখা হল 'লা নিনা'। নাবিকদের অনেক পরে 'এল নিনো' এবং 'লা নিনা' বিজ্ঞানীদের নজরে আসে। পেরুর মতই পৃথিবীর কতকগুলি দেশে আবহাওয়ার অপ্রত্যাশিত বিস্ময়কর আচরণের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা 'এল নিনো' বা 'লা নিনা'-র সঙ্গে তার যোগাযোগ লক্ষ্য করলেন। দক্ষিণ-পূর্ব বাণিজ্য বায়ুর প্রভাবে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্র স্রোত প্রবাহিত হয় পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে। 'এল নিনো'র প্রভাবাধীন সময়ে বাণিজ্য বায়ু দুর্বল, সমুদ্র স্রোতের দিক পরিবর্তিত হয়ে প্রবাহিত হয় পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে, পেরু স্রোতটি হয়ে যায় দুর্বল। অন্য দিকে 'লা নিনা' প্রভাবাধীন সময়ে বাণিজ্য বায়ু হয় স্বাভাবিকের চেয়ে প্রবল, সমুদ্র স্রোত পুনরায় প্রবাহিত হয় পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে, পেরু স্রোত হয়ে ওঠে স্বাভাবিকের চেয়েও শক্তিশালী। প্রশান্ত মহাসাগরের এই অস্বাভাবিক পরিবর্তন ভারতের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ 'এল নিনো'-র আবির্ভাব হলে সেই বছরে ভারত ও তার পার্শ্ববর্তী দেশে খরা পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়। 'লা নিনা' জানায় ভাল বর্ষার আগমনী। ভারতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাসের জন্য আবহাওয়াবিদের কাছে 'এল নিনো' বা 'লা নিনা'-র আর্ভিাব তাই এক গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কেত।

(১০) পৃথিবীর আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণে অ্যান্টার্কটিকা পরিক্রমাকারী স্রোতটির গুরুত্ব অপরিসীম। এর প্রভাব 'এল নিনো' ও 'লা নিনা'-র চেয়েও ব্যাপক। ২০০৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীরা তাসমানিয়া দ্বীপের দক্ষিণে ৮০০-১০০০ মি গভীরতায় প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আসা গহীন জলের একটি অতি শক্তিশালী স্রোত আবিষ্কার করেন। অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের বেষ্টনকারী দক্ষিণ সমুদ্রে এই শক্তিশালী স্রোতটি প্রবেশ করেছে। তারপর মহাদেশটি প্রদক্ষিণ করে সৃষ্টি করেছে একটি অতিকায় আবর্ত। এর সঙ্গে মিশেছে উষ্ণ আটলান্টিক গহীন স্রোত ও ভারত মহাসাগর থেকে আসা স্রোত। এই মিশ্রিত স্রোত (Meridional Overturning Circulation)-এর মাধ্যমে অধোগমন ও উৎসারণ প্রক্রিয়ায় কখনও গহীন স্রোত, কখনও বা সমুদ্রপৃষ্ঠ স্রোতরূপে উপরোক্ত তিনটি মহাসাগরেই ফিরে যাচ্ছে (চিত্র নং ২)।

এইভাবে প্রকৃতি সর্বত্র তাপমাত্রার সাম্যাবস্থা বজায় রাখছে। তাপের এই বণ্টনে সমুদ্রস্রোতের অবদান শতকরা ৫০ ভাগ, বাকি ৫০ ভাগ সাধিত হয় বায়ুমণ্ডলে বায়ুপ্রবাহের দ্বারা। আবহাওয়া আর জলবায়ু এই নামদুটি জল এবং বায়ুর এই অঙ্গাঙ্গী সমনামেরই দ্যোতক।

জলবায়ুর গবেষণা এখন আর শুধু বিজ্ঞানীদের বিলাসমাত্র নয়। সর্বত্রই একটা আশঙ্কার ছায়া। জলবায়ুর কি পরিবর্তন হচ্ছে? কি তার পরিণাম? কিছু বিজ্ঞানীদের অভিমত পরিণাম অতি ভয়াবহ—কোথাও হতে পারে অতি বর্ষণ ও বন্যাজনিত শস্যহানি অন্যত্র হয়ত তীব্র খরার ফলে শস্যহানি। সামুদ্রিক ঝড় আরও প্রলয়ঙ্করী রূপ নেওয়ার আশঙ্কা। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও উপকূল অঞ্চল প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা ইত্যাদি। এর মূলে রয়েছে পৃথিবীর উষ্ণায়ণের আশঙ্কা—দায়ী করা হচ্ছে শিল্পায়ন ও অরণ্যধ্বংসজনিত বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধিকে। অন্য এক দল বিজ্ঞানী মনে করেন এই আশঙ্কা অমূলক। যুক্তি ও নানা রকম পরীক্ষার সাহায্যে তাঁরা দেখিয়েছেন প্রকৃতি নিজেই কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম। আর পৃথিবীর উষ্ণায়ণও হচ্ছে প্রাকৃতিক কারণে। প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীরা বলেন যে পৃথিবীর উষ্ণায়ণ এখনই লক্ষ্য করা গেছে যার ফলে উত্তর মেরুর আর্কটিক সাগরে হিমশৈলের পরিমাণ যাচ্ছে কমে। সমুদ্রজল উষ্ণ হয়ে উঠলে স্রোতের অধোগমন বাধাপ্রাপ্ত হবে। আটলান্টিক গহীন স্রোত দুর্বল ও ক্রমে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ফলে MOC শৃঙ্খলটি ছিন্ন হবে। সমুদ্রস্রোতের মাধ্যমে তাপের বণ্টন ও তাপমাত্রার সাম্যাবস্থা বজায় রাখার প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াটি হবে বিপর্যস্ত। তাই পৃথিবীর জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ও সব দেশের সরকারের প্রতিনিধিরা ঘন ঘন বৈঠকে বসছেন। দেশের স্বার্থ রক্ষা করে জলবায়ুর সাম্যাবস্থা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ কমানোর জন্য বিভিন্ন দেশের কোটা নির্দিষ্ট করা নিয়ে বিতর্কে বৈঠক উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। তাই জলবায়ু হয়ে উঠেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়।

উমা

আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণ এক সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

সমীরকুমার ব্যানার্জী

মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা হল বায়ুমণ্ডল। এই বায়ুমণ্ডলের নানা অবস্থানকে জানায় আবহাওয়া। পৃথিবীতে মানুষের উদ্ভবকালের সময় থেকেই তখন থেকে আবহাওয়া মানুষের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত। শিশু যখন প্রথম ভূমিষ্ঠ হয়—গরম, ঠাণ্ডা ও বাতাসের অনুভবের মাধ্যমে সে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্পর্কে সচেতন হয়ে যায় এবং তারপর যখন এর কোনও একটির কিছু তারতম্য ঘটে, সে নানাবিধ ভাবে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। আবহাওয়া আমাদের সকল মৌলিক কর্মের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখে, যথা খাদ্য উৎপাদন, সাধারণ জীবন ধারণ ও বিশেষ প্রয়োজনে। বিশ্বব্যাপী আবহাওয়া সভ্যতাকে এক নির্ধারিত দিকে এবং আদর্শরূপে গঠন করতে বাধ্য করছে। আবহাওয়া মানুষের ওপর দৈনন্দিন জীবনের কোনও না কোনও ভাবে পরিব্যাপ্ত প্রভাব বিস্তার করে।

আবহাওয়াবিদ্যা মূলত আবহাওয়ার বিভিন্ন রকমের লক্ষণীয় পরিমানক যথা তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বাতাসের গতিবেগ, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনার সুবিন্যস্ত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত। আবহাওয়াবিদ্যার মূলত তিনটি দিক আছে। প্রথমটি, আবহাওয়া সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য নির্ধারিত সময়ে পর্যবেক্ষণ; দ্বিতীয়, এই সব তথ্যগুলি বোঝা ও বিশ্লেষণ এবং তৃতীয়, আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া।

আবহাওয়াবিদ্যা এক বিশেষ বিদ্যা শুধুমাত্র এ জন্য নয় যে এর সম্পর্ক প্রাকৃতিক নিয়মের বা তার বাহ্য ব্যাপার সংক্রান্ত নিয়ে জড়িত। আবহাওয়ার গঠন ও তার প্রকাশ কোনও দেশের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সীমা মানে না। এটা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কোনও সীমারেখা না মেনে প্রভাব বিস্তার করে।

আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সরাসরি ও স্বল্পব্যয়ে কোনও দেশের উন্নতি ও গঠন প্রণালীতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। এটা অনেক জরুরি সেবা বা পরিষেবার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যেমন কৃষি, বিমান চালনা, জাহাজ চালনা, সেচ, জলানুসন্ধান, মৎস্যকারী সেবা, পর্যটন, জল সম্পদ পরিচালনা, বিদ্যুৎ সঞ্চালিত ব্যবস্থা ইত্যাদি। বিভিন্ন রকমের জলবাহিত বিপর্যয়ের ও দুর্যোগ পরিচালনায় এবং গুরুত্ব সহকারে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের গুণমান নির্ধারণ এবং জীবন সুরক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে এর প্রয়োজন। বলা যেতে পারে আবহাওয়াবিদ্যা বায়ুমণ্ডল, ভূস্থল ও সাগর সমাহিত বিজ্ঞান শাখা, তার জন্য প্রয়োজন এই তিন শাখার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ।

প্রকৃতি ভারতকে এক অদ্বিতীয় উদ্ভিদবর্গ ও ভৌগোলিক স্থান প্রদান করেছে। ভারতের জলবায়ু গ্রীষ্মমণ্ডল (Tropic) ও নাতিশীতোষ্ণ (Tempernte) অঞ্চলে অবস্থিত। মূলত ভারত এক গ্রীষ্মমণ্ডল দেশ, যার আকার ও আয়তন এক উপমহাদেশের মতো সমান। দক্ষিণের গঠন এক উপদ্বীপের (Penisular) মতো, তিন দিকে বিশাল সমুদ্র এবং প্রায় ১০,০০০ কি মি দক্ষিণ সীমানা জুড়ে তার নিকটতম প্রতিবেশি হল দক্ষিণ মেরু (Antarctica), বিষুবরেখা (Equator) ছাড়িয়ে। এই দুটি সীমার মধ্যে আছে শুধু সাগরের জল আর কোনও স্থল নেই। আবার উত্তরে পৃথিবীর সব থেকে উচ্চ পর্বতমালা (হিমালয়) একটি বিরাট পাঁচিল, এর চতুর্থ দিকে অবস্থান। ভারতের উত্তর সীমা হল তিব্বত উচ্চভূমি (Tibetan Plateau) যার গড় উচ্চতা প্রায় পাঁচ কি মি সমুদ্র সমতল থেকে।

এই অদ্বিতীয় বিশেষ প্রাকৃতিক ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য ভারতের আবহাওয়া ও তার আঞ্চলিক আবহাওয়া এক বিচিত্র রূপ লাভ করে। এটা খুব স্বাভাবিক যে এই কারণের জন্য এখানে বিভিন্ন রকমের আবহাওয়ার পরিস্থিতি নানারকম সময়গত মাপে (Temporal Scale), বিস্তারগত মাপে (Spatial Scale), আয়তনে ও আকারে প্রতিফলিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, খুব কম বিস্তারের স্থানকেন্দ্রিক মেঘের আকস্মিক প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত ও ঝড় (ক্লাউড বার্স্ট ও টর্নেডো) থেকে নিয়ে বিরাট আয়তনের সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় (সাইক্লোন) হয়। আশ্চর্যভাবে নিয়ম করে প্রতি বছর দুটি মৌসুমী বায়ু ঋতু (মনসুন), দুটি সামুদ্রিক ঝড়ের ঋতু বা প্রাক মৌসুমী বায়ু (প্রি-মনসুন) ও মৌসুমী বায়ুর পরের ঋতু (পোস্ট মনসুন), তারই মধ্যে গরম প্রবাহ (হিট ওয়েভ) ও শীতপ্রবাহ

আবহাওয়াবিদ্যা এক বিশেষ বিদ্যা তার কারণ শুধুমাত্র যে এর সম্পর্ক প্রাকৃতিক নিয়মের বা তার বাহ্য ব্যাপার সংক্রান্ত নিয়ে জড়িত বলে নয়। আবহাওয়ার গঠন ও তার প্রকাশ কোনও দেশের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সীমা মানে না। এটা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কোনও সীমারেখা না মেনে প্রভাবান্বিত করে।

(কোল্ড ওয়েভ) এবং গ্রীষ্মকালে স্থানীয় প্রচণ্ড বজ্র বিদ্যুৎপূর্ণ ঝড় বৃষ্টি সঙ্গে শিলা বৃষ্টি— পূর্বভারতে যা কালবৈশাখী নামে পরিচিত এবং পশ্চিম ভারতে যা-কে আঁধি (ডাস্ট স্টর্ম) বলা হয়। প্রতি বছর এই সব আবহাওয়া সংক্রান্ত প্রণালীগুলি কিন্তু আয়তনে, তীব্রতা বা সংখ্যায় এক না-ও হতে পারে বা হয় না। এটাই হল আবহাওয়ার খেয়ালি খেলা। ভারতে একই ঋতুতে এক প্রান্তে অতিবৃষ্টি, অন্য প্রান্তে অনাবৃষ্টি হয়। এক জায়গায় গরম, অন্য জায়গায় শীত প্রায় লক্ষণীয়ভাবে দেখা যায়। এটাই ভারতের আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য।

এই বৃহৎ বিভিন্ন সময়গত মাপের ও ব্যাপ্তিগত মাপের আবহাওয়া প্রণালী গঠনে (ওয়েদার ইভেন্টস্) বিভিন্নতা থাকায় তার নিরূপণ ও পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজন এক বিশাল ঘনবদ্ধ মজবুত দ্রুত যান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা যা সদাজাগ্রতরূপে এই সব আবহাওয়া গঠন ও তথ্যগুলির পর্যবেক্ষণ করতে ও পূর্ব লক্ষণে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়।

উল্লেখিত বিভিন্ন আবহাওয়ার সঠিক নিরূপণের প্রয়োজনে সুবিন্যস্তভাবে সাজানো হয় নানা প্রকারের সংবেদী উপকরণ (সেন্সরস্) যা দিয়ে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বাতাসের দিক ও গতিবেগ, বায়ুর চাপ নির্ধারণ করা যায়। যেহেতু আবহাওয়া বিস্তার ত্রিমাত্রিক (থ্রি ডাইমেনশনাল) সেহেতু আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ পালন করে ভূতলস্তরে আবহাওয়া তথ্য (সারফেস্ অবজারভেশন), বায়ুমণ্ডলের উপরিস্তরে আবহাওয়া সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য (আপার এয়ার অবজারভেশন) এবং আবহাওয়া রেডার পর্যবেক্ষণ। এলাহি এই যন্ত্রাংশ সমন্বিত বিন্যাস (নেটওয়ার্ক)। আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণের এক বিশেষ ভূমিকা নেয় ভূ-সমলয়ে স্থির আবহাওয়া উপগ্রহ (জিও-স্টেশনারি স্যাটেলাইট) যার দ্বারা পৃথিবীর এক নির্ধারিত অঞ্চলের ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়া সংক্রান্ত ছবি ও তার থেকে উৎপন্ন আবহাওয়া সংক্রান্ত নানা তথ্য পাওয়া যায় প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে।

এই সব বিভিন্ন স্তরের আবহাওয়া তথ্যগুলি পর্যবেক্ষণের পর সেইগুলি আবহাওয়া পর্যালোচনা কেন্দ্রে খুব তাড়াতাড়ি পাঠান হয় বিভিন্ন দূরসঞ্চার মাধ্যমে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইন্টারনেট, নিজস্ব দূরসঞ্চার ব্যবস্থা আর সঞ্চার উপগ্রহ। বেশ কিছু জায়গায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবহাওয়া তথ্য (অটোমেটিক ওয়েদার স্টেশন) পর্যবেক্ষণ হওয়ার পর তার লিপিবদ্ধ রূপ সোজাসুজি উপগ্রহের মাধ্যমে আবহাওয়া পর্যালোচনা কেন্দ্রে পৌঁছায়। এখানে এ কথা বিশেষ করে বলে রাখা দরকার যে, এক নির্দিষ্ট সময় ও স্থানের বায়ুমণ্ডলের অবস্থানকে আবহাওয়া বলে এবং এটা নিশ্চল নয়, বরং সদা পরিবর্তনশীল অবস্থায় থাকে। তাই আবহাওয়া সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তার বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতি ও তার পরবর্তী অবস্থানের জন্য। এটা আবহাওয়ার পূর্বাভাসের এক অঙ্গ। কয়েক ঘণ্টা পরে এই তথ্যগুলির গুরুত্ব পূর্বাভাসের কাজ স্বাভাবিকভাবে কমে যায়। কিন্তু এই সব বিলম্বিত তথ্যগুলিই আবহাওয়ার গড়। যাকে বলা হয় সেই অঞ্চলের জলবায়ু (ক্লাইমেট), তা নিরূপণ করতে এগুলি ব্যবহৃত হয়।

আধুনিক আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ অপেক্ষাকৃত উন্নত হয়েছে এবং সাথে সাথে কর্মপ্রণালীও জটিল হয়েছে। এরই সঙ্গে সঞ্চার ব্যবস্থার বিপুল উন্নতি হয়েছে এবং তারই ফল স্বরূপ এখন আবহাওয়ার বিভিন্ন তথ্যাবলি পর্যবেক্ষণ দ্বারা লিপিবদ্ধ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন আবহাওয়া পর্যালোচনা কেন্দ্রে পাঠানো ও আদান-প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।

বর্তমান মনুষ্যকৃত আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের বদলে বহু স্থানে স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক আবহাওয়া পর্যবেক্ষক স্থাপন করা হচ্ছে। এগুলির স্থাপনার স্থান বিশেষভাবে নির্ভর করে এক জায়গার প্রাপ্তিসাধ্য উপযুক্ত কর্মচারির ওপর। স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া তথ্য কেন্দ্র (অটোমেটিক ওয়েদার স্টেশন), খুব সুবিধাজনক হয় দুর্গম পাহাড়ি

অঞ্চলে বা যেখানে বিশেষ কোনও সাধারণ পরিসেবার অভাব আছে সড়ক, বিদ্যুৎ, জল প্রভৃতি অবকাঠামো। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যেখান থেকে বৃষ্টির জল নদীতে নামে (Catchment area), মরুভূমি বা পাহাড়ি জায়গায়। যদিও সেখানে এই স্বয়ংচালিত যন্ত্রগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা কঠিন।

যেখানে পর্যবেক্ষক দ্বারা আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণ করা হয়, সেখানে সাধারণত তিন ঘণ্টা অন্তর আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু স্বয়ংচালিত আবহাওয়া তথ্য পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (AWS) গুলিতে প্রতি ১০-১৫ মিনিট অন্তর তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ করা সম্ভব।

ভূপৃষ্ঠ স্তরের আবহাওয়া পর্যবেক্ষক (Surface observer) মূলত বায়ুমণ্ডলের চাপ, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বাতাসের গতি ও দিক, বৃষ্টিপাত,দৃশ্যমানতা (visibility), মেঘের বিস্তারিত বিবরণ এবং গত তিন ঘণ্টার আবহাওয়ার ঘটনা (যেমন, ঝড়, বজ্রগর্ভ মেঘ বা বজ্রপাত তথ্য) পর্যবেক্ষণের দ্বারা লিপিবদ্ধ করে।

উচ্চতর বায়ুমণ্ডলের (Upper Air) পর্যবেক্ষক একটি বেলুন যা ক্রমাগত বিশেষ দূরবিমান দ্বারা অনুসরণ করে উচ্চতর বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে ৫-৬ কি মি পর্যন্ত বাতাসের গতি ও দিক পর্যবেক্ষণ করে। এই সব তথ্য সাধারণত 06 UTC 18 UTC দৈনিক দুবার ভারতের ৬২ স্থান থেকে নেয়া হয়। উচ্চতর বায়ুমণ্ডলের আরও ও বেশি তথ্য পর্যবেক্ষণ করা হয় Radio theodolite ও Radio sonde -এর দ্বারা নিয়মিত ভাবে সাধারণত দুবার 00UTC ও12 UTC-তে ভারতে ৩৯ স্থান থেকে। রেডিওসোন্ডে (Radio sonde) একটি বৈদ্যুতিন যন্ত্র যাতে তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও বায়ুর চাপ মাপার সংবেদী ব্যবস্থা (সেন্সর) লাগানো থাকে এবং যা বায়ুমণ্ডলের এই তথ্যগুলি বিভিন্ন স্তর থেকে মাপ করে বেতার-এর মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠ স্থাপিত যন্ত্রে (গ্রাউন্ড বেসড্ রিসিভারে) ধরা পড়ে। এই বৈদ্যুতিক সঙ্কেত উচ্চতর বায়ুমণ্ডলের প্রায় ৩০ কি মি উচ্চতা অবধি নেওয়া যায়। রেডিওসোন্ডে-টি বেলুনে বেঁধে তাকে বায়ুবাহিত করা হয়। তা প্রত্যেক মিনিটের ব্যবধানে ওপরে উল্লিখিত তথ্যগুলি মাপে এবং বৈদ্যুতিক সঙ্কেতের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠে রিসিভার-এ সেগুলি লিপিবদ্ধ হয়। রেডিওসোন্ডে বায়ুবাহিত হবার পর থেকে ক্রমাগত Radio theodolite দ্বারা একে অনুসরণ করা হয় স্বয়ংচালিত ভাবে। প্রত্যেক মিনিটে অনুসরণ পথের তথ্য দিয়ে বায়ুর বিভিন্ন স্তরের গতি ও দিক ভূপৃষ্ঠ স্থাপিত যন্ত্রের বিশেষ কম্পিউটর সফটওয়্যার সাহায্যে নিরূপিত হয়।

ভূতল ও উচ্চতর আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণ তথ্যগুলি বিভিন্ন প্রকারের আবহাওয়া মানচিত্রে চিহ্নিত করে আবহাওয়ার মানচিত্র তৈরি করা হয়, যা নির্দিষ্ট সময়ে আবহাওয়ার অবস্থান নির্দেশ করে। তারপর এই অবস্থানগুলিকে মৌলিক গণনা ও পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়ম প্রয়োগ করে আবহাওয়ার আগামি পরিস্থিতি কি হতে পারে তা নির্ণয় করা হয়। এরই ভিত্তিতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জারি করা হয়। আধুনিক আবহাওয়া কেন্দ্রে আজকাল এই মূল তথ্যগুলি বিশাল কম্পিউটার-এর সাহায্যে নির্ধারিত প্রণালী অনুসারে বর্তমান আবহাওয়া মানচিত্র প্রস্তুত করে ও তার বিশ্লেষণ করে আবহাওয়ার ৭ থেকে ১০ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়। এই প্রথাকে বলা হয় নিউমারিক্যাল ওয়েদার প্রেডিকশন (NWP) বা আবহাওয়ার গাণিতিক পূর্বাভাস।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আবহাওয়া সংক্রান্ত পূর্বাভাস সাধারণ জনগণ এবং বিভিন্ন পরিষেবার বিশেষ কাজের জন্য প্রয়োজন হয়। ঐ সব সেবার জন্য বিভিন্ন মাত্রার ভিন্ন ভিন্ন আবহাওয়া তথ্যের ও তার পর্বভাগের প্রয়োজন হয়। সেইগুলি কিছু মিনিট, কয়েক ঘণ্টা, কয়েক দিন বা কয়েক মাসের জন্য হতে পারে এবং কিছু বর্গমিটার থেকে কয়েক বর্গ কি মি বা কয়েক শত বর্গ কি মি বিস্তৃত স্থান-কেন্দ্রিক হতে পারে।

আবহাওয়া রেডার (ওয়েদার রেডার) পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এক বিশাল অঞ্চলের আবহাওয়া প্রক্রিয়া ও গঠন নিরূপণ করা যায়। সেই কারণে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণে আবহাওয়া রেডার-এর এক বিশেষ গুরুত্ব আছে। এর দ্বারা তার ৩০০-৩৫০ কি মি ব্যাসার্ধের মধ্যে যে কোনও ঝড়, বিশেষ করে বজ্র-বিদ্যুৎপূর্ণ ঝড় ও মেঘ, ক্ষণকালীন প্রচণ্ড বাত্যা ঝোড়ো বাতাস, শিলাবৃষ্টি, কালবৈশাখী আঁধি, বৃষ্টিপাত নিরূপণ করা যায় এবং কী রকম গতি ও তীব্রতার সাথে কোন দিকে এই সব ঘটনাগুলি অগ্রসর হচ্ছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়। এখন ডপলার ওয়েদার রেডার দিয়ে রেডার-এর সব তথ্য সংখ্যায় (কোয়ান্টিটি) ব্যক্ত করা যায়। তবে ডপলার ওয়েদার রেডার-এর মাধ্যমে সব তথ্যের ব্যাখ্যা করা খুব সহজ নয়। তার ব্যাখ্যার জন্য বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। রেডার শূন্য ঘণ্টা থেকে পাঁচ ঘণ্টার ঝড়ের বা ভারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিতে সাহায্য করে। উপকূলে অবস্থিত রেডারগুলি যখন কোনও সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় তার দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসে তখন এই ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস সতর্কবার্তা দেবার জন্য খুবই উপযোগী। সঠিকভাবে এই ঝড়ের অবস্থানকে দেখানোর কাজ চলে অবিচ্ছিন্নভাবে। রেডার দ্বারা ঘূর্ণিঝড়ের বাতাসের তীব্রতা ও ব্যাপক স্থানে বৃষ্টিপাত এক সময়-মধ্যে নিরূপণ করা যায়।

স্থায়ী উপগ্রহ দ্বারা অবিচ্ছিন্নভাবে বিশাল অঞ্চলের পর্যবেক্ষণ করার এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। আবহাওয়া পূর্বাভাসের জন্যও এ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে যেখানে অন্য কোনও যান্ত্রিক বা হস্তচালিত পর্যবেক্ষণ, কোনও ব্যবস্থা নেই বা যেখানে কোনও আবহাওয়া তথ্য সরাসরি পাওয়া সম্ভব নয়—যেমন সমুদ্র ও পাহাড়ি অঞ্চল।

এখন কিছু বিশেষ পরিষেবার জন্য কী রকম আবহাওয়া তথ্য আর তার পূর্বাভাসের প্রয়োজন হয় সেগুলি সংক্ষিপ্তভাবে দেখা যাক—

কৃষি সেবা: কৃষির প্রত্যেকটি ধাপে প্রয়োজনীয় পরিচর্যার জন্য আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য ও পূর্বাভাসের প্রয়োজন হয়—জমি প্রথম চাষ, বীজ রোপন থেকে ফসল ফলানো, ফসল কাটা ও তাকে ঘরে তোলা পর্যন্ত। এই সেবার জন্য দরকারি আবহাওয়া তথ্যগুলি হল বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, বাতাসের গতিবেগ, হিমপাত, শিলাবৃষ্টি, শিশির। এবং এই সেবার জন্য প্রয়োজন কখনও মাত্র কয়েক ঘণ্টার পূর্বাভাস কখনও বা ২৪ ঘণ্টা আবার কখনও সাত থেকে দশ দিনের। সেইসঙ্গে প্রয়োজন ঋতুর পূর্বাভাসের। মূলত বর্ষাঋতুর শুরু এবং যতি।

মৎস্যজীবী ও জাহাজ চালনা: প্রতি দিনে বাতাসের গড় বেগ ও দিক, সমুদ্র পথের দৃষ্টিগোচরতা (ভিজিবিলিটি), সমুদ্রের উত্তালতা, তরঙ্গের উচ্চতা এবং ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস।

বিমানচালনা: এই সেবার জন্য বিশেষ প্রকার আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাসের প্রয়োজন। বিমান সেবার নিত্য প্রয়োজনীয় কার্যপ্রণালীর জন্য কিছু বিশেষ আবহাওয়া সংক্রান্ত যান্ত্রিক উপকরণের দরকার। প্রাক-উড়ান পরিকল্পনা (প্রি-ফ্লাইট প্ল্যানিং) থেকে অবতরণ পর্যন্ত বিমানচালনার বিভিন্ন পর্যায়ের কাজকর্মে দরকার কিছু কিছু মাত্রার আবহাওয়ার তথ্য এবং পূর্বাভাস। এই সেবার জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস দরকার কয়েক মিনিট থেকে শুরু করে ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টার। বিমানচালনার উল্লেখনীয় পর্যায়গুলি হল—

১) বিমানের উড্ডয়নের জন্য দৌড় (Take off run)
২) বিমান উড্ডয়নের জন্য বিমানকে ঊর্দ্ধে তোলা ও ওপরে ওঠা (Lift off and climb out)
৩) নির্ধারিত উচ্চতায় পৌঁছান (Level of Cruise)
৪) নির্ধারিত উচ্চতা থেকে নামা (The descend)
৫) ভূমিস্পর্শকরণ ও রানওয়েতে অবতরণ দৌড় (Touch down and landing run)

এই পাঁচটি পর্যায়ে বিশেষ আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ দ্বারা অর্জিত তথ্যের প্রয়োজন হয়। এ কথাটি জানা দরকার যে বিমান সব সময় রানওয়ের থেকে উড্ডয়ন ও অবতরণ করে চলতি বাতাসের বিপরীত দিক থেকে, তাই বাতাসের দিক ও গতি সংক্রান্ত তথ্যটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। উড্ডয়ন দৌড়ের কালে বাতাসের তাপমানও একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য। Altimeter একটি যন্ত্রটি বিমানের উড্ডয়ন সফরকালীন উচ্চতা মেপে যায় কারণ তাকে নির্দিষ্ট বিমানবন্দরে বায়ুমণ্ডলের চাপের সঙ্গে সংযোজন করা বিশেষ দরকার হয় বিমানের সঠিক উচ্চতা নির্ধারণ করার জন্য। নিরাপদে বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণের জন্য দৃষ্টিগ্রাহ্যতা (visibility) তথ্যটিও সেই সঙ্গে এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

বিমানবন্দরে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের যন্ত্রগুলি রানওয়ে-র দুই প্রান্তে এবং মাঝখানের এক পাশে স্থাপন করা হয়। অনুকূল আবহাওয়ায় আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ প্রতি ঘণ্টায় হলেও চলে। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ায় বিমানবন্দরে বিমান উড্ডয়ন, অবতরণ এবং বিমানচালনায় জড়িত অন্য সব কাজের জন্য প্রয়োজন ঘন ঘন আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ।

বিমানবন্দর এলাকায় বিমানচালনার জন্য যে সব আবহাওয়া সংক্রান্ত বিপদ বা ঝুঁকি আছে, সেগুলির ব্যাপ্তি ০.৫ কি মি থেকে ৫ কি মি এবং সময়ের মাপে ৫ থেকে ৫০ সেকেন্ড হতে পারে। এই বিশেষ প্রয়োজনীয়তার জন্য এখানে আবহাওয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে পর্যবেক্ষণের সাথে সরাসরি বিমানচালন নিয়ন্ত্রকের কাছে পৌঁছানো দরকার।

তথ্য: এই সব তথ্যগুলি হল তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বাতাসের গতি ও দিক, দৃষ্টিগ্রাহ্যতা, মেঘের সর্বনিম্ন উচ্চতা (Cloud Ceiling), বায়ুচাপ ও রানওয়ের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত কত দূর অবধি দেখা যাচ্ছে (Runway Visual Range [RVR])। এই সমষ্টিগত যান্ত্রিক উপকরণকে বলে "Integrated Aeronautical Meteorological Instrument" । আবহাওয়া সংক্রান্ত বিপদের সতর্কবার্তার জন্য বিমানবন্দরে রেডার পর্যবেক্ষণ একান্ত প্রয়োজন এবং এর থেকে পাওয়া তথ্যগুলি নিরাপদ বিমানচালনার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যদিও আবহাওয়াবিদ আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার করেন এবং নিত্য নতুন উন্নত মানের যান্ত্রিক উপকরণের দ্বারা উন্নত মানের আবহাওয়া তথ্য দিয়ে আবহাওয়া সংক্রান্ত নানা অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা করছেন আবহাওয়া প্রণালীর গঠনগুলি বুঝবার এবং উন্নততর পূর্বাভাসের জন্য; তবু এখনও পর্যন্ত আবহাওয়া সম্বন্ধে জ্ঞান অসম্পূর্ণ , তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনও আবহাওয়ার পূর্বাভাসের ব্যাপারে সন্দেহ রয়ে গেছে এবং এটা খুব স্বাভাবিক। **উমা**

প্রমিথিউসের পথে আবার প্রকাশিত হল—নতুনভাবে

স জনাস ইন্দ্রঃ

অজানা চৌধুরি

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ
যস্ তন্ন বেদ কিম ঋচা করিষ্যতি।। ১।১৬৪।৩৯

ঐ যে দূর মহাকাশে অবিনাশী অক্ষর ঋকেরা (ছন্দোবদ্ধ সত্যবাক্) গাঁথা রয়েছে, ঐখানে আসীন বিশ্বদেবতারা। এই দৈবী উপলব্ধি যার নেই সে কি করবে ঋক দিয়ে? —ঋকটির মর্মার্থ আর একটু বিশদ করে বলা যাক্, — গভীর মননে তাকিয়ে দেখ দূরের আকাশকে—নিবিড় প্রত্যক্ষ দর্শনে উপলব্ধি করতে পারবে বিশ্বপ্রকৃতিতে নিহিত সত্যগুলো। এ কথা যে উপলব্ধি করতে পারলো না তার কাছে স্তোত্র (ঋক্ বা ঋচা) অর্থহীন। তৎকালীন দেবতারা হ'ল সূর্য-চন্দ্র-তারা-পৃথিবী-ঊষা-রাত্রি, অর্থাৎ প্রকৃতি-পরিবেশে যা কিছু দেখছি—অনুভব করছি— বস্তু, সময়, এই সব কিছু। সারা বিশ্ব প্রাণময়।

এই অসীম আলোকোজ্জ্বল আকাশ তার সূর্য-চাঁদ-তারা নিয়ে প্রাচীন মানুষের কাছে প্রতিভাত হয়েছে এক বিস্ময়কর প্রাণবন্ত ঘড়ির মতো। এই ঘড়িটার আশ্চর্য দুটো কাঁটা সূর্য আর চাঁদ অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠভাবে নির্দিষ্ট পথে আবর্তিত হয়ে সময়সীমা তো নির্দেশ করছেই ঋতুবিভাজনও ঠিক করে দিচ্ছে। তারার সংকেতে জানাচ্ছে ঋতুদের আসন্ন আগমন কাল। সূর্য-চাঁদের দিবি-বিচরণের মাইলফলক তো এই আপাত-স্থির নক্ষত্র পট। নক্ষত্রগুলো দেবগৃহ—'দেবগৃহা বৈ নক্ষত্রাণি'। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের এই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় আরবের 'মঞ্জিল' আর চীনের 'সিউ' (Hsiu) কথাদুটোয়। দুটি কথারই অর্থ আবাস—নক্ষত্রদের বাসগৃহ।

প্রতিদিনের সূর্যের উদয়-অস্ত, চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি এবং তৎসহ জোয়ার-ভাঁটার উত্থান-পতন, সূর্যের বাৎসরিক উত্তর-দক্ষিণ সঞ্চালন ও সেইসঙ্গে ঋতুদের পুনরাবৃত্তি—এইসব পৌনঃপুনিক নৈসর্গিক ঘটনাগুলো থেকেই সময়ের বোধ, সময়-পরিমাপক এবং ঋতু-বিভাগের ব্যবস্থা জন্ম নিয়েছে। সুতরাং কৃষিসভ্যতার প্রারম্ভেই, মানুষের বিজ্ঞান-চেতনার ঊষাকালে, আমরা দুটি জায়মান বিজ্ঞান-চিন্তা—জ্যোতির্বিদ্যা ও আবহবিদ্যাকে একই সঙ্গে উঠে আসতে দেখি—একে অন্যের পরিপূরক হয়ে। প্রতিটি প্রাচীন সভ্যতায় মিশরে, মেসোপটেমিয়ায়, ভারতে, চীনে বর্ষপঞ্জী-ঋতুবিভাগের সঙ্গে (calendaric astronomy) জড়িয়ে আছে মেঘ-বৃষ্টি-বাতাস ও শস্য-কর্ষণের অভিজ্ঞান—অর্থাৎ প্রাচীন পৃথিবীর আবহাওয়াবিজ্ঞান।

সভ্যতার ঊষা-লগ্ন থেকেই বিজ্ঞান-মনস্কতাকে মানব-সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বললে মোটেই ভুল হবে না। পশ্চিম ইয়োরোপের গুহাচিত্রে বিভিন্ন পশুর ভঙ্গিমার যে প্রতিফলন দেখা গেছে, stonehenge-য়ে সূর্যের বিভিন্ন অবস্থিতি বোঝবার যে প্রচেষ্টার স্ফুরণ রয়েছে—সেইসব, —সুচারু নিরীক্ষণ এবং গভীর মনন ছাড়া সম্ভব কি? নিরীক্ষা ও তার সুষ্ঠু প্রকাশ এই দুই-য়ে মিলেই তো গড়ে ওঠে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রথম ধাপ। এই বিজ্ঞান-চেতনার ক্রম-বিবর্তন ঘটেছে হাজার হাজার বছর ধরে। বংশপরম্পরায় মানবসমাজে বাহিত হয়ে এসেছে নানা শিল্পের করণ-কৌশল, বিভিন্ন দক্ষতা—আর সেই পথেই উঠে এসেছে বিজ্ঞান চিন্তাগুলো। বহু উত্থান-পতন, ভ্রান্তি-শুদ্ধি ডিঙোতো ডিঙোতে আজ মহাকাশে প্রাণের উৎস সন্ধানে বেরিয়েছে মানুষের বিজ্ঞান প্রচেষ্টা। একদিন হঠাৎ অগ্ন্যুৎপাতের মতো কোনো এক বিশেষ মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে বিজ্ঞান-চেতনা এসেছিল একথা ভাবা সত্যের বিচ্যুতি মাত্র। বিজ্ঞান-ভাবনা তৈরি হয়েছে বিশ্বমানবের সম্মিলিত চেষ্টায়, ধীরে ধীরে ঘটনা পরম্পরায়। ঘর্ষণে আগুন জ্বলেছিল সভ্যতার প্রথম প্রহরে, (ঋগ্বেদে আগুনকে বলা হত—সূনুঃ শবসা — বলের পুত্র)। তারপর হাজার হাজার বছর পরে বোঝা গেল কেন ঘর্ষণজাত আগুন জ্বললো। অ্যালকেমিস্টদের কল্পলোকের পরশ-পাথর পাওয়া যায় নি কিন্তু সেই সোনা খোঁজার ব্যর্থ প্রচেষ্টা থেকেই জন্ম নিয়ে উঠে দাঁড়াল একালের রসায়ন-বিজ্ঞান। সুতরাং অন্তঃসলিলা বিজ্ঞান-চেতনার উৎসমুখটা অবশ্যই সভ্যতার প্রত্যূষায়।

মানুষের বিজ্ঞান চেতনার গোড়ার দিকে যখন প্রাকৃতিক ঘটনাবলীগুলো নিয়ে ভাবা হচ্ছে তখন চিন্তাগুলো স্বভাবতই গাণিতিক ভাষায় প্রকাশ করতে পারা যায় নি, কারণ সুদৃঢ় গণিতের ভাষা তখন তৈরি-ই হয় নি। সভ্যতার সেই আদিপর্বে বিজ্ঞান-চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে প্রতীকী ভাষায় —একটা চিহ্ন (symbol) বা মূর্তিরূপ (icon) কল্পনায়, মিথের রূপকধর্মিতায়—দৈবী রসায়নে জারিত হয়ে। সেই দৈবীকরণের বাইরের আবরণটা সরিয়ে ফেললেই ভেতরের বাস্তব

অভিজ্ঞতা-প্রসূত সত্যটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে। মিশরের দেবী আইসিস্ যে লুব্ধকনক্ষত্র এবং পূর্বদিগন্তে এই তারাটির ঊষা-উদয়ে যে দুটি সমান্তরাল ঘটনার (নীল নদের বন্যা আর উত্তরাগত Etesian Wind) সমাপতন ঘটতো তা আজ সকলেই জানে তবে একটু অগোচরে আছে এই কথা যে, দেবীর আগমন-সংবাদ জানবার জন্য বেশ কিছু নিবিষ্ট নিরীক্ষা ও ঘষা-মাজা করা হত দীর্ঘকাল ধরে। সূর্যসান্নিধ্যে নক্ষত্রদের উদয়াস্তকাল নিয়ে বহু মৃৎলিখন (Cuneifom Texts) রয়েছে ব্যাবিলনে। এই প্রাচীন বীক্ষণধারার (heliacal rising and setting of stars) প্রচলন ছিল ঋগ্বেদের কালেও। সূর্যসান্নিধ্যে তারার ঊষা-উদয় আর সূর্যাস্তের পরে ঠিক বিপরীতে তারার সান্ধ্য-উদয় দিয়ে ঋতু-বিভাজন করা হত সেইসময়। তাই প্রতিদিন ঊষা ও সন্ধ্যায় পূর্বদিগন্ত রেখা নিরীক্ষিত হত নিয়ম করে। প্রথমটাই হত বেশি, ঋগ্বেদের ঊষাদেবীরা তাই অনেক, একজন নন। 'অর্জুন উষঃ প্র আরন্ ঋতুন্ অনু দিবঃ অন্তেভ্যঃ পরি' (১।৪৯।৩)—'শুভ্রবর্ণা ঊষা তুমি সকল ঋতুকেই অনুসরণ করে আকাশ-প্রান্তে দেখা দাও'।

বেদ-পূর্ব সময়ের একটা জ্যামিতিক চিহ্নের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলে বোধহয় প্রাচীন বিজ্ঞান-ভাষার ধরণটা বোঝা যাবে। চিহ্নটি স্বস্তিকা-চিহ্ন—বামাবর্ত এবং দক্ষিণাবর্ত উভয় চেহারাতেই পাওয়া গেছে হরপ্পা শহরের সর্বনিম্নস্তর থেকে। ছোট ছোট চতুষ্কোণ (০″.৭x০″.৭) —টেরাকোটার সিলগুলোতে কোনও অক্ষর লেখা নেই। এই ক্ষুদ্র সিলগুলো পরপর সাজালে বোঝা যায় কেমনভাবে স্বস্তিকা চিহ্নটির উদ্ভাবন করা হয়েছে। চিহ্নটিতে একই সঙ্গে বিধৃত আছে সূর্যের আহ্নিক ও বার্ষিক গতির অভিমুখ এবং সেই সঙ্গে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে ক্ষিতিজ বৃত্তের (horizon) ওপরে উত্তরায়ণে সূর্যের ঊর্দ্ধগামিতা, দক্ষিণায়নে নিম্নগামিতা। সূর্য ঋতুকর্তা, দিন ও রাতের নিয়ামক। ক্ষিতিজ বৃত্তের বেশ উপরে উঠে গেলে গ্রীষ্মে দিনের আলোর স্থায়িত্বকাল বাড়ে আবার শীতকালে সূর্যের ক্রম-অবরোহণে দিনের আলোর স্থায়িত্বকাল কমে। দিনের আলোর স্থায়িত্বকাল (daylight hours) চাষের পক্ষে জরুরি তাই সূর্যের এই ওঠা-নামা আর দক্ষিণায়ন দিনের খোঁজ রাখত হরপ্পার কৃষি-সভ্যতার মানুষেরা। বর্ষার সঠিক আগমন সংবাদ না জানলে কি আর উদ্বৃত্ত কৃষিজাত সম্ভার এবং তাই নিয়ে ব্যাপক বহির্বাণিজ্য তৈরি করা যেত? স্বস্তিকা চিহ্নটি তাই একটি প্রাচীন ফর্মূলা বলে মনে হয় যা লোককে স্মরণ করিয়ে দিত সূর্যের আপাতদৃষ্ট চলন-ভঙ্গি। স্বস্তিকা সমন্বিত লম্বা আয়তাকার সিলগুলোতে সন্নিবিষ্ট থাকতো চারটি পশু—দুপাশে। ঋতুভেদে পশুগুলির আচরণ বৈশিষ্ট্যই নির্দিষ্ট পশুগুলোর নির্বাচনের মূলসূত্র। মনে রাখতে হবে, হরপ্পার মানুষেরা 'hunter-gatherer' পর্যায় থেকে কৃষি সভ্যতায় সংস্থিত হয়েছে। পশুগুলোর আচরণ তাদের নখদর্পণে।

হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকল্পনা, উপবৃত্তাকার কুঁয়ো-মুখ, উল্লম্ব শঙ্কু ও আইভরি স্কেলের ব্যবহার, (যা রোদে বাড়ে-কমে না), ক্রমনিম্নাভিমুখী Corbelledarch সমন্বিত জল-নিঃসরণ ব্যবস্থা—এগুলো কি বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দেয় না? এই Proto-historicকালের স্বস্তিকা চিহ্নের ওপর পরবর্তীকালের ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার শৈবাল-জাল জমা হয়েছে। কিছু লোক কেন যে এটাকে আর্যচিহ্ন ভাবেন তা বোধগম্য হয় না। ঋগ্বেদে সূর্যের আরোহণ-অবরোহণের বার্ষিক চলনের আভাস পাওয়া যায় এই ঋকে—'যাতি দেবঃ প্রবতা যাত্যুদ্বতা যাতি শুভ্রাভ্যাং যজতো হরিভ্যাম্' (১।৩৫।৩) সবিতাদেব (সূর্য) দুটি অয়নে (বৎসরার্দ্ধ) কখনও নিম্নগামী কখনও ঊর্দ্ধগামী। অবশ্য সংশ্লিষ্ট চারটি পশু (যারা স্বস্তিকার সহযোগী ছিল)—তাদের কথা ঋগ্বেদে কোথাও চর্চিত হয় নি।

হরপ্পা সভ্যতার লোকেরা সূর্যের উত্তর-দক্ষিণ সঞ্চালন ভালভাবে নির্দিষ্ট করতে পেরেছিল বলেই মহেঞ্জোদারোর রাস্তাগুলো খাড়াখাড়ি পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণমুখী হয়েছে। এই রাস্তাগুলোর সঠিক ঋজুতা দেখে প্রত্নতাত্ত্বিক জন্ মার্শালও অবাক হয়েছিলেন। তখন না ছিল কোনও কম্পাস, না ছিল উত্তরদিকনির্দেশকারী উজ্জ্বল কোনও তারা। তখনকার মেরুতারা থুবান ছিল অত্যন্ত নিষ্প্রভ। দিকচক্রবালে সারা বছরে সূর্যের সর্বোত্তর এবং সর্বদক্ষিণের **উদয়বিন্দু** ও **অস্তবিন্দু**-ই ছিল দিক্‌দিশারী।

এই Proto-historic কাল থেকে আসুন ঋগ্বেদের কালে। সূর্য-সম্পর্কিত ঋকটি একটু দেখি—

সপ্ত যুঞ্জন্তি রথমেকচক্রমেকো অশ্ব বহতি সপ্তনামা।
ত্রিনাভি চক্রমজরমনর্বং যত্রেমা বিশ্বা ভুবনাধি তস্থুঃ।।
(১।১৬৪।২)

সূর্যের একশচক্র রথে সাতটি ঘোড়া যুক্ত রয়েছে, মুখ্য ঘোড়া একটাই, সাতটা নাম তার। একটা চাকার তিনস্থান বদ্ধ (নাভি অর্থ বন্ধন), চাকাটি অজর, নিজেই ঘুরছে অবিরাম, বিশ্বভুবন এই চাকাতেই স্থিত। কি সাঙ্ঘাতিক স্ববিরোধিতা! চাকাটা তিনস্থানে আটকানো থাকলে ঘুরবে কি করে? ঘুরবে। কারণ চাকাটা সৌরবৎসর আর তিনটে নাভি সূর্যের তিনটে নির্দিষ্ট অবস্থিতি-বাসন্ত-বিষুব (Vernal Equinox—পূর্বে), দক্ষিণায়ন দিন (Summer Solstice —সূর্য উত্তরে কর্কটক্রান্তিরেখায়) এবং উত্তরায়ণ দিন (Winter Solstice—সূর্য দক্ষিণে মকরক্রান্তি রেখায়)। (অবশ্য এখানে বলে রাখা দরকার যে, সৌরবৎসরটি চিরকাল মোটামুটি অজর থাকলেও, সৌর-অবস্থিতি তিনটে চির-স্থির নয়। অয়ন-চলনের জন্য (precession of equinoxes) এই বিন্দুস্থিতিগুলো চলিষ্ণু। অয়নচলনের কথা তখন

জানা ছিল না।) সূর্যের এই তিনটে অবস্থিতি মোড় ঘুরিয়ে দেয় ঋতুচক্রের, গ্রীষ্ম থেকে বর্ষা, বর্ষা থেকে শীত। সারা ঋকবেদে এই তিনটি নাভির নক্ষত্র সংস্থান নিয়ে রয়েছে বহু ঋক্। এখন ঘোড়ার কথায় আসি। অনেক ব্যাখ্যাকার বেদের সাতটা ছন্দকে সপ্তাশ্ব বলেছেন, অনেকে বলেছেন সপ্তবর্ণ আলো। কিন্তু এ দুটোর একটাও এখানে প্রযোজ্য নয়। সপ্ত কথাটা এসেছে কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে। বেদে অশ্ব অর্থ রশ্মি (ব্যাপ্তার্থক অশ্ ধাতু)। বিস্তৃত স্থানে গতি ব্যাপ্ত করে তাই ঘোড়াও অশ্ব। কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ বেদের কালে ছিল বাসন্ত-বিষুবে অর্থাৎ বিষুব সংক্রান্তির সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে কৃত্তিকাকে পূর্বদিগন্তে দেখা যেত। কালটা ২৩৫০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ এবং কৃত্তিকার অবস্থিতি বাসন্ত-বিষুবে প্রায় দু-হাজার বছর। প্রাচীনকালে এই নক্ষত্রপুঞ্জের সাতটি তারা খালি চোখে দেখা যেত আর তাদের নাম ছিল যজুর্বেদে—অম্বা, দুলা নিতত্নি, চুপুনিকা ইত্যাদি। পরে দেখা যেত ছ'টি (তাই কার্তিককে ষড়ানন বানানো হয়)। কৃত্তিকাকে ঋগ্বেদে বলা হয়েছে সপ্ত-মাতৃকা (সপ্তশিবাসু মাতৃষু ১।১৪১।২) বা সপ্ত স্বসারঃ (সপ্তস্বসারো ... যত্র গবাং নিহিতা সপ্ত নাম)—স্বসার অর্থ বোন। দিব্যাগ্নি অর্থাৎ সূর্যকে বলা হয় 'সপ্তযহ্বী'—যহ কথাটার অর্থ সক্রিয় হয়ে ওঠা, সপ্তযহ্বী—সপ্ত প্রাণধারা বহন করে যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। পার্থিবাগ্নি মানে ভূমিতে যে আগুন জ্বালানো হয় আকাশে জ্যোতিষ্কদের যজ্ঞের অনুকৃতিতে সেটাকে বলা হয় সপ্তশিখ অগ্নি—এইসব অগ্নিশিখার নাম—ভ্রাজ, বিভাস, জ্যোতিষ্মন্ত ইত্যাদি। যজ্ঞ মানে পূজার্চনা, বৎসর, যাত্রা। বেদের শব্দার্থ বহুস্তরিক। অতএব মুখ্য অশ্বের নাম কৃত্তিকা, অথর্ববেদে নক্ষত্রচক্রের মুখ্য নক্ষত্র কৃত্তিকা। এখানে শতপথ ব্রাহ্মণের একটি উক্তি প্রাসঙ্গিক—'এতা হ বৈ প্রাচৈ ন চ্যবন্তে'—কৃত্তিকা কখনো পূর্বদিক থেকে সরে যায় না। ঋগ্বেদের প্রথমে বৎসরারম্ভ হত মহাবিষুব সংক্রান্তিতে (বাসন্ত-বিষুব)—যজুর্বেদে উত্তরায়ণ দিন থেকে আর ব্রাহ্মণকালে রবির অবস্থিতি যখন ৩৩০° ডিগ্রিতে—অর্থাৎ বসন্ত ঋতুতে, মধুমাস প্রথম মাস।

দিব্য অগ্নিকে ঋগ্বেদে ত্রিমস্তকযুক্তও বলা হয়, সূর্যের তিনটে অবস্থিতি স্মরণে রেখে—'ত্রিমূর্ধানং সপ্তরশ্মিং গৃণীষ ইহ নূনং অগ্নিং পিত্রোরুপস্থে'---আকাশ-পিতার কোলে ত্রিমূর্ধাযুক্ত, সপ্তরশ্মিবিশিষ্ট অগ্নি বসে রয়েছে। বিষ্ণু (সূর্য) ঋগ্বেদে ত্রিপাদ—অর্থাৎ তিন পদবিক্ষেপে ভুবন পরিক্রমা করে এই একই কারণে। বিষ্ণুর দেবরূপ কল্পনায় তার তৃতীয় পদবিক্ষেপটি পড়েছে সর্পশীর্ষ বলিরাজের শিরে। এই সর্পশীর্ষ রাজা অশ্লেষা নক্ষত্রের প্রতীক। রাজা-র সংযোজন পৌরাণিক কালের, পঞ্চশীর্ষ সর্পের প্রতীকটি ঋগ্বেদের। অশ্লেষার নক্ষত্রগুলি ঋগ্বেদের কালে সূর্যের দক্ষিণায়নের শুরুতে সূর্যালোকে অবলুপ্ত হত (heliacal setting)। কলকাতার মিউজিয়ামে একটি সমপাদস্থানক বিষ্ণুমূর্তির পায়ের তলায় পঞ্চশীর্ষ সাপ দেখতে পাবেন। সমপাদস্থানক বিষ্ণুমূর্তি দক্ষিণায়ন দিনে (Summer Solatice) আপাত-স্থির হয়ে থাকা সূর্য। এই দক্ষিণায়ন দিনের পরেই সারা উত্তর-পশ্চিম ভারত জুড়ে মৌসুমী বাতাস ছড়িয়ে পড়বে—আর নামবে বৃষ্টি। এই আশা বোধহয় ব্যক্ত হয়েছে নীচের ঋকটিতে—

কৃষ্ণ নিয়ানং হরয়ঃ সুপর্ণ অপো বসানা দিবমুৎপতন্তি।
ত আ ববৃত্রন্ সদনাদৃতস্যাদিদ্ ঘৃতেন পৃথিবী ব্যুদন্তি।।
(১।১৬৪।৪৭)

সূর্যরশ্মিরা (সুপর্ণ) উত্তরায়ণের পথে জল শোষণ করে নিয়ে আকাশে চলে যায় (দিবম্ উৎপতন্তি) আবার সেই জল (ঘৃত), (পরিশুদ্ধ জলকে ঘৃত বা মধু বলা হত ঋগ্বেদে)—ফিরে আসে (আববৃত্রন্) দক্ষিণায়নের পথে (কৃষ্ণ নিয়ানং---সূর্যের অবরোহণকাল), ভিজিয়ে দেয় (ব্যুদন্তি) পৃথিবীকে।

এই উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ন দিন স্থির করা হত প্রাচীন পৃথিবীতে উল্লম্ব-শঙ্কু (Vertical gnomon) দিয়ে। উত্তরায়ণ দিনের মধ্যাহ্নকালীন শঙ্কু-ছায়া হবে সবচেয়ে দীর্ঘ এবং দক্ষিণায়ন দিনে সবচেয়ে ক্ষুদ্র। কৃষিসভ্যতার কালে এই দক্ষিণায়ন দিনটি ছিল ঋতুবিভাজন এবং কৃষিকাজের datum point। ভূমিকর্ষণ, বীজবপন শুরু হত বর্ষার বৃষ্টিপাতের পরে।

জলচক্রের (Water Cycle) নিরবচ্ছিন্ন আবর্তনের কথা এই ঋকটিতে এবং অন্যান্য ঋকেও বিবৃত হয়েছে।

সমানম এতৎ উদকম অহভিঃ উৎ চ এতি অব চ এতি
সমান উদক উত্তরায়ণের দিনগুলিতে উপরে যায় আবার সমান উদক দক্ষিণায়নের দিনে অধোগমন করে।

হবিষা জারো অপাং পিপর্তি পপুরির্নরা।
পিতা কুটস্য চার্ষণি।। (১।৪৬।৪)

আদিত্য সমুদ্র থেকে জল শোষণ করে—আবার তা পূরণ করে বৃষ্টি দিয়ে। অনস্বীকার্য যে, এটা একটা নিবিষ্ট প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ-সঞ্জাত মন্তব্য।

ক্রান্তিবৃত্তে (ecliptic) যে প্রধান চারটে ঋতুদিশারী সূর্য অবস্থান পৃথিবীর ঋতু পরিবর্তনের বাঁক ফেরাতে সাহায্য করে তারা হল—উত্তরায়ণ বিন্দু (২২শে ডিসেম্বর নাগাদ),বাসন্ত-বিষুব (২১শে মার্চ নাগাদ), দক্ষিণায়ন বিন্দু (২১শে জুন নাগাদ) ও শারদ বিষুব (২৩শে সেপ্টেম্বর নাগাদ) ঋগ্বেদে এই চারটে সৌর অবস্থিতি ও তৎসম্পর্কিত নক্ষত্রসংস্থান বহু চর্চিত। একাধিক ঋকে ঋভু নামে এক নক্ষত্রদর্শীর কথা বলা হয়েছে যিনি এই চারটে সৌর অবস্থিতির সন্ধান দিয়ে মানুষ থেকে দেবত্বে উন্নীত হয়েছিলেন ঋগ্বেদের কালেই। 'একং বিচক্র চমসং চতুর্বয়ং' (৪।৩৬।৪) একটা চমস ভেঙে চার টুকরো করেছিলেন ঋভু। চমস একটি চতুর্বর্গাকার যজ্ঞীয় সোমপাত্র। প্রাচীন কালের জ্যোতির্বিদ্যা ছিল পৃথিবী কেন্দ্রিক সুতরাং চমস পৃথিবীকেন্দ্রিক

রবিমার্গও বোঝায়। হরপ্পার সর্বনিম্নস্তরে স্বস্তিকা-চিহ্ন-শোভিত চারভাগে ভাগ করা বর্গাকার সিলগুলো কি উপরিউক্ত ঋকের বাস্তবায়িত রূপ? ঋভু কি হরপ্পা সভ্যতার নক্ষত্রদর্শী? এই সূত্র খোঁজার কারণ—এই দুটি বিগত সভ্যতার জ্যোতির্বিদ্যার চিন্তায় বহু সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। এই প্রবহমানতা আজও পরিদৃশ্যমান বহু আইকনে।

এখানে একটা কথা পরিষ্কার বলা দরকার যে ঋগ্বেদ পুরোপুরি বিজ্ঞানগ্রন্থ নয়, যদিও এর এক অঙ্গ জ্যোতির্বিদ্যা আবার পুরোপুরি ধর্মগ্রন্থও নয়। ঋগ্বেদ তৎকালীন মানুষের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। প্রকৃতি-পরিবেশ, সামাজিক রীতি-নীতি, ইতিহাস-ভূগোল, মানুষের মনের ঘোর-প্যাঁচ, ধর্ম-দর্শন সব পাবেন। আমি বেছে নিয়েছি জ্যোতির্বিদ্যা জড়িয়ে বেড়ে-ওঠা আবহবিদ্যাকে এবং সেই প্রসঙ্গে ইন্দ্রকে কারণ—ইন্দ্রই ঋগ্বেদের সর্বজ্যেষ্ঠ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। তার নামে প্রায় তিন শতাধিক ঋক্। ঋগ্বেদের ভরকেন্দ্র ইন্দ্র।

ইন্দ্র কথাটার শব্দতত্ত্বমূলক দীর্ঘ আলোচনায় নানা পণ্ডিতের নানা মত। ইন্দ্, ইন্ধ্, ইন্ বা ইরা যে কোনও একটা ধাতু থেকে ইন্দ্র শব্দটাকে গড়ে পিটে বার করা যায়। যাস্ক বলেন ইন্দু থেকেও হয়—ইন্দু + রম্ (সোমে যে আনন্দ পায়) বা ইন্দু + দ্রু (সোমের প্রতি যে ধাবমান)। ম্যাক্সমূলারও তাই বলেন। ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরা বলেন এটা হিট্টাইট বা মিট্টানি মানব-গোষ্ঠী থেকে পাওয়া loan word । ম্যাক্সমূলার বলেন নিপাট ভারতীয়। এসব কথা একপাশে সম্ভ্রমভরে সরিয়ে রেখে আমরা সরাসরি ঋষিদের ঋকে ঢুকে পড়ি। সেই ভালো।

ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের নেম ঋষি বড় সংশয়-সংকুল প্রশ্ন তুলেছেন—কে এই ইন্দ্র? ইন্দ্র বলে কি কেউ আছে? কে তাকে দেখেছে? কাকে স্তুতি করব? একথা একদম ঠিক যে, আকাশের দিকে তাকালেই দিনে-রাতে সূর্য-তারা-চাঁদের মতো ইন্দ্রকে দেখা যায় না। তবে? ক ঈং দদর্শ কমভি ষ্টবাম? (৮।১০০।৩)

এই সংশয়-দীর্ণ প্রশ্নগুলোকে উড়িয়ে দিয়ে গৃৎসমদ্ ঋষি একঝাঁক ঋকে উত্তর দিলেন—

ওজায়মান যো অহিং জঘান — স জনাস ইন্দ্রঃ
যো দ্যাম্স্তভনাৎ — স জনাস ইন্দ্রঃ
হত্বাহিমরিণাৎ সপ্ত সিন্ধুন্যো —স জনাস ইন্দ্রঃ
যো সুশিপ্র সুতসোমস্য —স জনাস ইন্দ্রঃ
যো অশ্মনোরন্তরগ্নিং — স জনাস ইন্দ্রঃ।।

জন্মেই যে অহি-নিধন করেছে, আকাশকে স্তব্ধ করে স্তম্ভের মতো ধরে রেখেছে, অহি-নিধন করে সপ্তসিন্ধুকে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত করে দিয়েছে, সোমধারায় যে সদাউৎসুক, দুই মেঘের সংঘর্ষে যে আগুন জ্বালায়—ওহে জনগণ সেই তো ইন্দ্র।

কথাগুলোর অন্তর্লীন অর্থ বিভিন্ন ঋকের সহযোগে সমন্বয়-সাধন করে বুঝতে চেষ্টা করলে একেবারেই আর আজগুবি লাগবে না। মোট কথা, এখানে উচ্চ কণ্ঠে বলা হয়েছে ইন্দ্রকে বুঝতে হলে তার কর্মকৃতি আগে বুঝতে হবে। 'ইন্দ্র আ যাহি ধিয়া ইষিতঃ বিপ্রজূতঃ'—মেধাবীদের বুদ্ধি দ্বারা প্রাপ্ত ইন্দ্র এসো — এসো। (১।৩।৫)

ইন্দ্রের সত্য স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পারে দুটি স্ববিরোধী ঋক্। একটিতে বলা হয়েছে ইন্দ্র সূর্যের একশচক্র রথের চাকা অপহরণ করে সূর্যকে নিশ্চল বানিয়েছে—'মুষায় সূর্যং কবে চক্রমীশান ওজসা'।

আবার আরেকটি ঋকে বলা হয়েছে—ইন্দ্র সহচর বন্ধু সূর্যকে দুই সবল বাহুতে তুলে ধরেছে— 'ত্বমিন্দ্র সজোষসমর্কং বিভর্ত্তি বাহ্বো'। একবার ইন্দ্র সূর্যের অনিষ্টকারী, আবার সে বন্ধু। কিন্তু দু-অবস্থাতেই সূর্যের নিশ্চলতাকে বোঝা যায়—একবার ভগ্নরথ অবস্থায়, দ্বিতীয়বার ইন্দ্রের বাহুধৃত অবস্থায় উঁচুতে উঠে। উত্তরায়ণ যাত্রা শেষে দক্ষিণায়ন বিন্দুতে এসে সূর্য আপাত-নিশ্চল হয়ে যায় (Summer Solstice - Solstice কথাটার অর্থ to stand still)। এই আপাত-নিশ্চলতার কর্মকাণ্ডটি ঘটায় দক্ষিণায়ন বিন্দু—যেখান থেকে শুরু হয় সূর্যের দক্ষিণায়ন যাত্রা। ইন্দ্র এই বিন্দুটির কল্পিত মূর্তিরূপ। একে আকাশে চোখ তুললেই দেখা যাবে না। ইন্দ্রের উপস্থিতি বুঝতে দরকার হবে মধ্যাহ্নকালীন শঙ্কু-ছায়া। দক্ষিণায়ন দিনে এই ছায়া হবে সবচেয়ে ছোট। প্রায় সাতদিন ধরে ক্ষুদ্রতম ছায়াটি শঙ্কুর পায়ের কাছে নট্ নড়ন-চড়ন হয়ে পড়ে থাকবে (কারণ সূর্যের ক্রান্তিবদলের হার এখন যৎসামান্য)—ভগ্নরথ সূর্য। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই সাতদিনের মধ্যবর্তী মুহূর্তটাকে দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি বলে গ্রহণ করা হত। কিন্তু এমন অবস্থাতেও মধ্যগ্রীষ্মের সূর্য উত্তরার্দ্ধে পৌঁছে গেছে প্রায় শীর্ষবিন্দুতে। সূর্যের আলো এখন কর্কটক্রান্তিরেখার উপরে লম্বভাবে পড়ছে। দক্ষিণায়ন বিন্দুর অধিদেবতা ইন্দ্র তাকে উঁচু করে তুলে ধরেছে। 'মহীং চিদ্ দ্যামাতনোৎ সূর্যেণ চাস্কভ চিৎ কম্ভণেন স্কভীয়ান'—ইন্দ্র ভারবহনে এতই পটু যে, স্থির হয়ে স্তম্ভের মতো আকাশকে তুলে ধরেছে—আর সেই আকাশ সূর্যকিরণে ঝল্মল্ করছে। রবির আলোর প্রাখর্য, সূর্যের উচ্চ অবস্থান এবং তার আপাত-নিশ্চলতা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় কি? আমরা যখন পড়ি, 'গঙ্গা যেন হেসে দুলায় ধূর্জটির জটা'—তখন কাব্যের নান্দনিকতার মধ্যে দিয়েই আমরা বুঝতে পারি শ্রাবণ আকাশের ঘনায়মান মেঘের বিপুল বিস্তারকে। সুতরাং ঋকের কাব্যময়তার আড়ালে লুকোনো ইন্দ্রের বাস্তবরূপটা বোঝা খুব বেশি দুরূহ নয়। দেখা যাক আরেকটা ঋক্।

'ইন্দ্র দীর্ঘায় চক্ষসে আ সূর্যং রোহয়দ্দিবি'—ইন্দ্র সূর্যকে আকাশে উঠিয়ে দিয়েছে সকলের দর্শনের জন্য। সূর্যশির ইন্দ্র স্তম্ভের রূপায়ণ রয়েছে অমরাবতীর বৌদ্ধ-ভাস্কর্যে, সূর্য এখানে স্বয়ং বুদ্ধের প্রতীক। ঋগ্বেদের কালে এই দক্ষিণায়ন বিন্দুর কাছে ছিল মঘা নক্ষত্র (Alpha Leonis)। এই নক্ষত্রের নামের সঙ্গে

সঙ্গতি রেখেই বোধহয় ইন্দ্রকে মঘবন্ বলা হয়। মঘবন্ কথাটির অর্থ দানশীল, ধনী (দানার্থক মংহ ধাতু)। ইন্দ্র ঋগ্বেদে রাধানাং পতি। রাধঃ—নৈসর্গিক ধন। জলেভরা মৌসুমী বাতাস, পর্যাপ্ত সূর্যের আলো (দিনের আলোর স্থায়িত্বকাল এইসময় সবচেয়ে বেশি), দীর্ঘদিনের সৌর শক্তি—এগুলোই তো Climatic asset —রাধঃ। এই আলো, বাতাস, জল, সূর্যতাপ দিয়েই তো পৃথিবীর মাটি-মা গড়ে তুলবে নতুন জীবন, অপর্যাপ্ত শস্য-উদ্ভিদ্। এই মঘাই ইন্দ্রকে মঘবান করেছে—'মঘৈর্মঘোনো অতি শূর দাশসি'।

শুধু শঙ্কু-ছায়া হলে চলবে না চাঁদের বিপ্রতীপতা (opposability) দিয়ে, নক্ষত্রের উদয়াস্ত দিয়ে cross-checking দরকার অদেখা দক্ষিণায়ন বিন্দুটির। মঘা নক্ষত্রের উদয় তো দেখা গেল কিন্তু অস্ত গেল কে? আসুন এই ঋকটিতে তা ব্যক্ত হয়েছে—'সপ্ত প্রতি প্রবত আশয়ানমহিং বজ্রেণ বি রিনা অপর্বন' (৪।১৯।৩)—এক পৌর্ণমাসী-তে অর্থাৎ পূর্ণিমায় ইন্দ্র আকাশে শয়ান অহিকে বাজ দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলে সাতটা নদী বইয়ে দিয়েছে। এই ঋকে চাঁদের বিপ্রতীপতা এবং অশ্লেষা নক্ষত্র (অহি)-টির সূর্য-সামীপ্যে অস্ত (Contiguity) গমন বা বিলুপ্তি এই দু-ধরনের প্রাচীন আকাশ-পর্যবেক্ষণ প্রথা প্রয়োগ করা হয়েছে। সূর্যালোকে মঘার অগ্রগামী নক্ষত্রভাগ অশ্লেষা (অহি)-র তারাগুলির বিলুপ্তিকে অহি-হনন বলা হয়েছে। পূর্ণিমার চাঁদ আর সূর্যের কৌণিক দূরত্ব একশো আশি ডিগ্রি। এই কারণে পূর্ণিমার চাঁদের নক্ষত্র-সংস্থান থেকে প্রথমে চান্দ্র পথ (Lunar Zodiac) এবং সেইসঙ্গে রবিমার্গে (ecliptic) অবস্থিত নক্ষত্র-রাশি চিহ্নিত করা যায়। 'অরংণো মাসকৃৎ বৃকঃ পথা যন্তং দদর্শ হি' (১।১০৫।১৮)—চন্দ্র মাস সৃষ্টি করে, তাই সে মাসকৃৎ এবং পূর্ণিমার চাঁদ অন্ধকার নাশ করে তাই সে বৃক। উপরন্তু পূর্ণ চন্দ্র নিজের পথ জানে—পথও দেখায়। বৈদিক মাসগুলো পূর্ণিমান্ত।

ইন্দ্র-সত্তা-আরোপিত দক্ষিণায়ন দিনে অহি-বধে বিষ্ণু (সূর্য) যেমন ইন্দ্রের 'যুজ্য সখা', মরুতেরাও ইন্দ্রের বন্ধু (মরুত্বা বৃষভো ইন্দ্র)। এইসব মরুতেরা উঠে আসে সাগর থেকে জল নিয়ে—'সমুদ্রাৎ ঊর্ম্মি মধুমান্ উদারৎ' (৪।৫৮।১) (ঊর্ম্মি কথাটার মানে রশ্মি) সূর্যরশ্মি জল (মধু) কুড়িয়ে নিয়ে উঠে আসছে সমুদ্র থেকে। তারা কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়—একইসঙ্গে বেড়ে ওঠা ভাইয়েরা—'অজ্যেষ্ঠাসো অকনিষ্ঠাস এতে সংভ্রাতরো বাবৃধুঃ সৌভগায়' (৫।৬০।৫)। একটা নির্দিষ্ট সময়ে এরা আসবেই —এরা 'সত্যশ্রুত' (৫। ৫৭। ৮)—অমৃতরূপ জল নিয়ে আসে এরা 'অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ'। (ঋত অর্থ সত্য, জল)। 'প্রশংসা গোষ্বঘ্ন্যং ক্রীড়ং যচ্ছর্ধো মারুতম। জম্ভে রসস্য বাবৃধে।' (১।৩৭।৫) রশ্মিজাত ক্রীড়াশীল মরুৎগণের শক্তির প্রশংসা কর এরা উদরে জল নিয়ে বেড়ে উঠেছে। (গোষু কথাটার অর্থ জল, রশ্মি, আলো)। সাগর থেকে বাষ্পের রসদ কুড়িয়ে আনা মৌসুমী বাতাসের বিশাল প্রবাহ দমকে দমকে ছুটে আসে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে দক্ষিণায়ন দিনের (ইন্দ্রের) আহ্বানে অহি-হননের (অশ্লেষা বিলুপ্তি) জন্যে। মরুৎগণের স্তুতিতে রয়েছে বহু ঋক্—সেগুলো এতই বাস্তবানুগ যে বলতে ইচ্ছে হয় যারা মৌসুমী বাতাসের চালচলন এত ভালভাবে বুঝতে পারবে তারা কি করে মৌসুমীবৃষ্টিবিবর্জিত মধ্য এশিয়ার তৃণভূমির বাসিন্দা হতে পারে? ঋগ্বেদের অভ্যুত্থান এইখানেই নয় কি?

সব দেবতার সোমাহুতি তিনবার—সকাল-সন্ধ্যে আর দুপুর। কিন্তু ইন্দ্রের প্রিয় সবন (সোমাহুতি) মাধ্যন্দিনে অর্থাৎ মধ্যাহ্নে। ইন্দ্র জন্মেই জ্যেষ্ঠ—কারণ ইন্দ্রের অবির্ভাবই হচ্ছে যখন উত্তর গোলার্দ্ধে সর্বোচ্চ ক্রান্তি (declination) রবিরশ্মি লম্বভাবে পড়ছে কর্কটক্রান্তি রেখার উপরে। মধ্যাহ্নের শঙ্কুর ছায়া সবচেয়ে ক্ষুদ্র, ইন্দ্র দক্ষিণায়ন দিনে সমাসীন। আকাশে ঘটছে পূর্ণচন্দ্রের বিপ্রতীপতা আর পৃথিবীতে চলছে তার অনুকৃতি—সোমাহুতি। এই সোমাহুতি একটা sympathetic magic। 'মমত্তু ত্বা দিব্যঃ সোম ইন্দ্র, মমত্তু যঃ সূয়তে পার্থিবেষু' (১০।১১৬।৩)—ইন্দ্র তোমাকে আকাশের চাঁদ মত্ত করে, মত্ত করুক পৃথিবীর সোমধারা। বলা বাহুল্য পৃথিবীর সোমটা একটা মাদক রস। তিনটি সংযুক্ত কলসীপূর্ণ সোমরস দেওয়া হচ্ছে ইন্দ্রকে কারণ তিনটি সংযুক্ত কলসী অজৈকপাদ (Alpha Pegasi) নক্ষত্রের প্রতীক যেখানে পূর্ণচন্দ্র সমাসীন।

কর্কটক্রান্তিরেখাই সর্বোত্তর সীমা যেখানে সূর্য দক্ষিণায়ন দিনে শীর্ষবিন্দুতে, এই চিন্তাটা ঋগ্বেদে ব্যক্ত হয়েছে এইভাবে—'যজ্জায়থা অপূর্ব্য মঘবন্ বৃত্রহত্যায় তৎ পৃথিবীমপ্রথয় ...'—বৃত্রহত্যার জন্যে উপস্থিত হয়ে ইন্দ্র পৃথিবীকে প্রশস্ত করে দিয়েছিল জন্মেই। (বৃত্র আর অহি একই অর্থ)

ইন্দ্র দক্ষিণ হাতে বজ্র ধরে (১।১৮।৯), দক্ষিণ হাতে বারিরাশি বিমুক্ত করে (৬।৩২।৫), দক্ষিণ হাতে বৃত্র বধ করে (৮।২।৩২), অদিতি (অখণ্ডনীয় আকাশ—ইন্দ্রের জননী)-র দক্ষিণ কুক্ষিভেদ করে জন্মেছে (৪।১৮।২)—(বুদ্ধের উপকথায় বুদ্ধও মায়াদেবীর দক্ষিণ কুক্ষিভেদ করে জন্মান), ইন্দ্র দক্ষিণ হাতে ধন দান করে (১০।১৮০।১)। এই দক্ষিণ কথাটার বারংবার প্রয়োগ ইন্দ্রের পরিচিতি নিয়ে আর কোনও আড়ালই রাখে না।

বৈদিক কালে ভাবা হত ইন্দ্রের বজ্রায়ুধ দুই মেঘের সঙ্ঘাতে সৃষ্ট অগ্নি। প্রায় দু হাজার বছর পরেও এই একই চিন্তার চারপাশে ঘুরে বেড়িয়েছেন গ্রীক চিন্তাবিদেরা। দুজন সমসাময়িক গ্রীক চিন্তাবিদ Thales এবং Anaximander মনে করতেন যে বাজ ও বিদ্যুৎ মেঘ ও তীব্রগতি হাওয়ার সঙ্ঘর্ষ-সঞ্জাত। শুধুমাত্র ইন্দ্র রূপকল্পনাটি তাঁরা ছেঁটে ফেলেছিলেন। গ্রীক যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তার অন্যতম জনক অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রিঃ পূঃ) যুক্তিতর্ক সংযোগে প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা দিয়ে বই লিখলেন Metorologica (৩৪০ খ্রিঃ পূঃ)। এই বই-এর নাম অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে আবহবিদ্যার নামচয়ন হল Meteorology।

অ্যারিস্টটল-এর শিষ্য Theophrastus বাতাস, আবহাওয়ার পূর্বাভাস নিয়ে বই লিখেছেন, কিন্তু সবই অনুমান নির্ভর, পরীক্ষিত সত্যের উপর ভিত্তি করে কার্যকারণ সূত্রগুলো দাঁড় করানো হয় নি (যেমন চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস যোগ করা—যেটা আজও অপ্রমাণিত)। কিন্তু তবু বলা যায় এইসময়ে মিথের রূপকধর্মিতা বাদ দিয়ে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো একটা যুক্তিতর্কের পথে আনা হল। প্রায় ২০০০ বছর ধরে এই অ্যারিস্টটল প্রদর্শিত অনুমানভিত্তিক পথেই চলেছে পাশ্চাত্য আবহাওয়াবিদ্যা। কিন্তু এরই মধ্যে ভারতবর্ষে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আমরা আঠারো ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত 'বর্ষমান' বা বৃষ্টি মাপার যন্ত্র ব্যবহারের খোঁজ পাই। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে উত্তর-পশ্চিম ভারত ও মহারাষ্ট্র অঞ্চলের এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছিল—জাঙ্গাল, অনূপ, অশ্মক ইত্যাদি নামে। এই বৃষ্টি নির্ভর অঞ্চলীকরণ (Climatic Zonation) প্রমাণ করে যে, ভারতবর্ষে সে যুগের কৃষিব্যবস্থায় আবহাওয়ার চিন্তাটাকে যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া হত। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত জানা এবং বিভিন্ন শস্য অঙ্কুরিত হতে ঠিক কতটুকু বৃষ্টিপাত (optimum rainfall) দরকার এইসব অভিজ্ঞান সঞ্চয় করা সময়সাপেক্ষ। অর্থশাস্ত্র মূলত একটি সংকলন গ্রন্থ। সুতরাং এটা ধরে নেওয়া যায় যে, একটা ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে কৃষকদের বৃষ্টি সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা সংকলিত হয়েছে অর্থশাস্ত্রে। (এখানে স্মর্তব্য যে, কৃষক এবং নাবিকেরাই আবহাওয়া বিদ্যার প্রথম সূত্রধর, এরাই প্রথম তক্ষণ করেছে আবহাওয়ার অভিজ্ঞতা আর সেগুলোকে প্রয়োগ করেছে প্রতিদিনের কাজে।) এরপরে মেঘের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে বেশ কিছু তত্ত্ব লেখা রয়েছে বরাহমিহির-কৃত বৃহৎসংহিতায় (আনুমানিক ৪৯৯ খিস্টাব্দ)

প্রাকৃতিক সত্যসন্ধানে অ্যারিস্টটেলীয় অনুমান-নির্ভরতাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করালেন ফ্রান্সিস বেকন খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। তাঁর মতে বৈজ্ঞানিক সত্যকে দাঁড়তে হবে দুপায়ে ভর দিয়ে—নিরীক্ষা ও পরীক্ষা। এই চিন্তায় অনুপ্রাণিত হলেন বিজ্ঞানীরা এবং খ্রিস্টিয় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে শুরু হল প্রকৃত আবহাওয়াবিজ্ঞান চর্চা—মিথোলজির রূপকল্পনা বাদ দিয়ে, জ্যোতির্বিদ্যার সহায়তা ছেড়ে, অনুমান নয়, পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষা-বিশ্লেষণকে সঙ্গী করে। এই সময়ে শুধু দৃশ্যমানতা নয় পরিমেয়তার মাপকাঠিতে আবহাওয়ার ভৌতবৈশিষ্টগুলো মাপা শুরু হল। শুধু বর্ণনাত্মক ভাষা আর যুক্তি-তর্ক নয়, আবহাওয়ার বিবরণ দেওয়া শুরু হল অঙ্কের ভাষায়। (দেকার্তের 'লে মেটিওর' বইটি তাঁর নিজস্ব গাণিতিক দর্শন পদ্ধতিতে লেখা প্রথম বই—আনুমানিক ১৬৪০ খ্রিঃ)।

গ্যালিলিও আবিষ্কার করলেন থার্মোমিটার ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে এবং তাঁর ছাত্র টরিসেলি আবিষ্কার করলেন ব্যারোমিটার ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে। প্রমাণ হল বাতাসের ওজন আছে (অ্যারিস্টটল বলতেন বাতাস ভরহীন), চাপ দেবার শক্তিও আছে।

পাস্কাল ১৬২৩-৬২ খ্রিঃ দেখালেন যে, উচ্চতার সঙ্গে বাতাসের চাপ কমে বা বাড়ে। ফলে বাতাসের চাপের সঙ্গে আবহাওয়া পরিবর্তনের সমসূত্রতা গাঁথা হল। বয়েল (১৬২৭-৯১) গ্যাসের আয়তন ও চাপের সম্বন্ধ নির্ণয় করলেন। নিউটনের (১৬৪২-১৭২৭) যুগান্তকারী বিজ্ঞান চিন্তা নতুন পথের সন্ধান দিল সারা বিশ্বকে। ১৬০০ থেকে ১৮০০ এই দুই শতক বৈজ্ঞানিক সচেতনতার এক বিশিষ্ট সময়। পদার্থবিদ্যা, গণিত ও রসায়নে বহু চিন্তার সংযোজন ঘটেছে এইসময় এবং প্রতিটি সংযোজন আবহাওয়া বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে ধীরে ধীরে। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে ফ্লোরেন্সে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হল Accademia del Cemento (Academy of Experimentation)। ইয়োরোপের একাংশে কিছুটা ব্যাপ্ত অঞ্চল জুড়ে ব্যবস্থা হল একই সময়ে বাতাসের চাপ-তাপ-আর্দ্রতা মাপার। এতে বোঝা গেল আবহাওয়ার আলোড়নগুলো সচল, স্থাণু নয়। বহু বৈজ্ঞানিক ও কলাকুশলীর হস্তক্ষেপে আবহাওয়ার যন্ত্রপাতিগুলোর নানা পরিবর্তন হয়েছে এই দুই শতক জুড়ে, সেই বৈচিত্রময় ইতিহাস প্রণিধানযোগ্য।

ঊনবিংশ শতকে জল ও তাপগতি বিজ্ঞানের সাহায্যে উন্নতমানের গণিতের অবদানে, টেলিগ্রাফ রেডিওর দ্রুত সংযোগে আবহবিজ্ঞান কৈশোর উত্তীর্ণ করেছে। সূর্যের তাপশক্তিকে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করছে পৃথিবীর বায়ুসমুদ্র আর জলসমুদ্র দুটোই, গায়ে-গা লাগিয়ে। অতএব বায়ুর আলোড়ন বুঝতে হলে বুঝতে হবে সমুদ্রস্রোতকেও। সামুদ্রিক আবহাওয়া আর সমুদ্র তুফান নিয়ে প্রচুর চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল এই শতকে। এই গবেষণা আবহাওয়া বিজ্ঞানকে ঘরোয়া সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বের আঙিনায় নিয়ে এল। সারা বিশ্বের নিত্যপরিবর্তনশীল বাতাবরণ আর পৃথিবী ঘেরা অশ্রান্ত সমুদ্র এই বিজ্ঞানের তথ্য সংগ্রহের পরীক্ষাগার। এর কোনও বিকল্প নেই, বিভাজনও নেই। এখানে কোনও ঘটনা তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে দুবার ঘটে না। তাই অতন্দ্র পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। পর্যবেক্ষণ শুধু সমতলে নয়। বাতাবরণের ত্রিমাত্রিক চিত্রও দরকার। বেলুনের ব্যবহার শুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে, এখন উপগ্রহ সংযুক্ত হয়েছে। বহু করণ-কৌশল আয়ত্ত করে, বহু তাত্ত্বিক পরিকাঠামোর ভাঙচুরের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে এসে আবহাওয়া বিজ্ঞান বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নিজের স্বতন্ত্র বৃত্তে এসে দাঁড়িয়েছে। এই পর্যন্ত এই বিজ্ঞানের সমগ্র উত্তরণের বিন্যাস এক চমকপ্রদ কাহিনী। তবু বলব সেই সলতে পাকানো যুগের কথা ধার করে—

যত্ সানোঃ সানুম্ আরুহদ্
ভুরি অস্পষ্ট কর্ত্বম

শিখর হতে শিখর যতই ওঠো তবু আরো বাকি আছে আরো-আরো।

উমা

আবহাওয়ার পূর্বাভাস—পদ্ধতি ও সমস্যা

গোকুলচন্দ্র দেবনাথ

ভাষান্তর: প্রদীপ্ত গুপ্তরায়

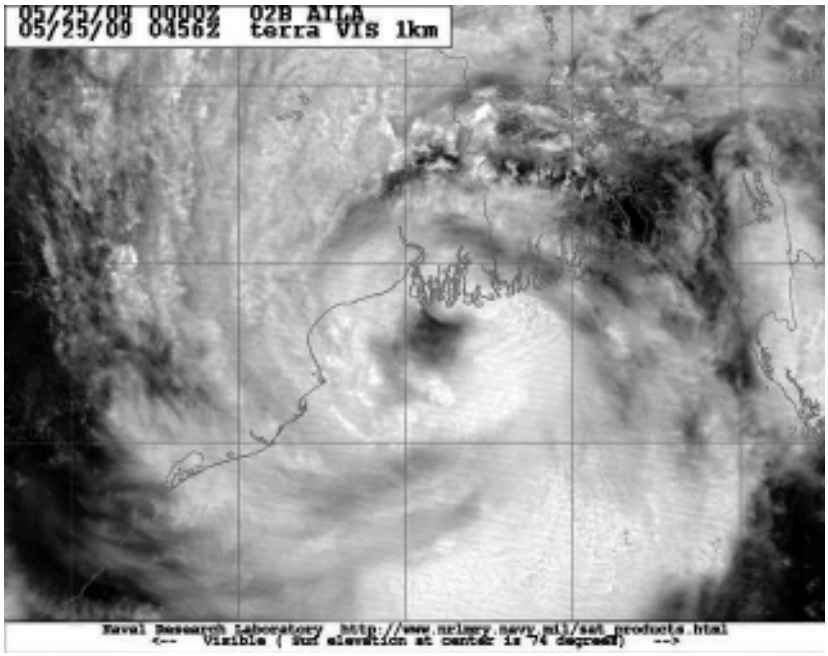

১। **আবহাওয়া**: আবহাওয়াকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। তবে সহজভাবে আবহাওয়া কি বলতে গেলে বলতে হয়,কোন বিশেষ জায়গায়, বিশেষ সময়ে বায়ুমণ্ডলের পরিস্থিতি। কিছু নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আবহাওয়ার আনুমানিক ভবিষ্যৎ-সম্ভাব্য অবস্থাকে আমরা আবহাওয়ার পূর্বাভাষ বলে থাকি।

২। **আবহাওয়ার পূর্বাভাষের ইতিহাস**:

(ক) **প্রাগিতিহাস:**

প্রথম কবে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দেওয়া হয় তার কোনও তথ্য আমাদের কাছে নেই। অতীতে, প্রাগৈতিহাসিককালে, যখন আজকালকার মতো আবহাওয়ার ছকটি বোঝার কোনও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছিল না, আবহাওয়ার পূর্বাভাষ পেতে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের চিহ্নগুলি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হতো এবং সেখান থেকে ভবিষ্যৎ আবহাওয়া অনুমান করতে হতো। তখন এই লোকজ্ঞান ছিল আবহাওয়া পূর্বাভাষের ভিত্তি। মেষপালক, নাবিক, কৃষকরা প্রাকৃতিক সকল পরিবর্তন লক্ষ্য করতো এবং আবহাওয়ার বিন্যাসের সাথে যোগ করার চেষ্টা করতো। এমনকি শিকারিরা আবহাওয়ার পরিবর্তনের সাথে প্রাণী ও পোকামাকড়দের আচার-ব্যবহার পরিবর্তনের যোগ লক্ষ্য করতো। এই বিন্যাস চেনাটাই (প্যাটার্ন রিকগনিশন) আবহাওয়া পূর্বাভাষের মূল ভিত্তি। কখন ফসল বোনা হবে এবং তোলা হবে—সেটা জানতে মানুষ মেঘের গতায়াত, আকাশের রঙ পরিবর্তনের সাহায্য নিত। এই নিরীক্ষণভিত্তিক অভিজ্ঞতাগুলোই এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে বাহিত হত এবং আবহাওয়া লোককথা হিসাবে পরিচিত হত।

(খ) **প্রাচীন কাল**:

আনুমানিক ৩৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল 'মেটিওরোলজিকা' (Meteorologica) নামে দার্শনিক তত্ত্বে ভর্তি চারখণ্ডের একটি বই লেখেন। কিভাবে বৃষ্টির মেঘ তৈরি হয়, শিলাবৃষ্টির কারণ—ইত্যাদি তত্ত্ব সম্বলিত এই বইটি আবহাওয়া তত্ত্বের এক আকর গ্রন্থ হিসাবে প্রায় দু'হাজার বছর ধরে ইওরোপে ব্যবহৃত হয়েছে। (প্রাচীনকালে আবহাওয়া চর্চার বিষদতর বৃত্তান্ত শ্রীযুক্তা চৌধুরীর প্রবন্ধে)

(গ) **আধুনিক কাল**:

যাই হোক, রেনেসাঁ যুগের শেষ দিকে, এই প্রকৃতি বিষয়ক দার্শনিক তত্ত্ব, পরিমণ্ডলের অবস্থা পরিবর্তন বিষয়ে আরো বেশি জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে অপ্রতুল মনে হলো। পরিমণ্ডলের চরিত্র বোঝা এবং আনুষঙ্গিক পরিমাপের জন্য যন্ত্রপাতির প্রয়োজন অনুভূত হল।

(ঘ) **বর্তমান কাল**:

১৯৯২ সাল থেকে ভূ-পৃষ্ঠের আবহাওয়া বিশ্লেষণের (Surface Analysis) জন্য কম্পিউটার ব্যবহার শুরু হয়। এবং ১৯৯৮ সাল থেকে সাংখ্য চিত্রণ (Digital Imagery) ব্যবহার শুরু হয়। উপগ্রহ, রাডার, অনুকৃতি তথ্য, ভূপৃষ্ঠের পর্যবেক্ষণে বর্তমানে এই আধুনিক ব্যবস্থার সাহায্য নিয়ে আবহাওয়া বিশ্লেষণের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তথ্য আহরণ করা হয়। প্রথম ছবিতে উপগ্রহ মারফৎ পাঠান আইলার চিত্রণে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

৩। **আবহাওয়া পূর্বাভাষের প্রয়োজনীয়তা**—

(ক) দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা, (খ) মূল আবহাওয়া-সংবেদনশীল কর্মকাণ্ড, (গ) প্রতিকূল আবহাওয়ার বিরুদ্ধে সাবধানতা নেওয়া (ঘ) স্বল্পকালীন পরিকল্পনা—ইত্যাদি বিষয়ের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাষ প্রয়োজনীয়।

৪। **আবহাওয়া পূর্বাভাষের রকমফের**:

(ক) স্বল্পমেয়াদি পূর্বাভাষ (Short Range weather Forecast [SRF])—পরবর্তী তিন দিন পর্যন্ত বলবৎ; এই পূর্বাভাষকে আবার দুটো উপবিভাগে ভাগ করা যায়: (১) তাৎক্ষণিক গণনা (Now Casting) —পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার জন্য বলবৎ; বিমান চলাচল এবং চরম আবহাওয়া যেমন বজ্র-বিদ্যুৎ-অতিবৃষ্টির সতর্কতার জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত। (২) অতি স্বল্পমেয়াদী পূর্বাভাষ (Very Short Range Forecast) —পরবর্তী একদিনের জন্য বলবৎ। (খ) মধ্য মেয়াদী পূর্বাভাষ (Medium Range Forecast) —পরবর্তী চার থেকে দশ দিনের জন্য বলবৎ। (গ) দীর্ঘ মেয়াদী পূর্বাভাষ (Long Range Forecast)—দশ দিনের থেকেও বেশি দিনের জন্য বলবৎ।

৫। **পূর্বাভাষ পদ্ধতি :**

(ক) **স্বল্পমেয়াদী পূর্বাভাষ (Short Range Forecast [SRF])**: এই পূর্বাভাষ [SRF] ছয়টি ধাপে তৈরি হয়। (১) আনুপূর্বিক উপাদান—আবহাওয়ার পরিমাপ এবং তথ্য সংগ্রহ। তথ্য সংগ্রহ প্রধানত তিন ধরনের উৎস থেকে হয়। (ক) ভূপৃষ্ঠ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (Surface Obsevations): ভূমিতে এবং সমুদ্রে (জাহাজের ও বয়ার সাহায্যে) মনুষ্যকৃত বা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দিনের কয়েকটি নির্দিষ্ট সময়ে ভূপৃষ্ঠের আবহাওয়ার উপাদানগুলি মাপা হয় ও লিপিবদ্ধ করা হয়। ভারত এবং প্রতিবেশি দেশে এই তথ্য গ্রহণের সময় ০০, ০৩, ০৬, ১২ এবং ১৮ GMT (UTC)। দ্বিতীয় ছবিতে একটি স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া কেন্দ্র দেখানো হয়েছে। (খ) বাতাসের উচ্চতর স্তরের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (Upper air Observations): আবহাওয়া বেলুন, ভূমিস্থ রাডার এবং পার্শ্বচিত্রক (Profiler)-এর সাহায্যে বাতাসের উচ্চতর স্তরগুলির তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ভারতে এই তথ্য গ্রহণের সময় ০০, ০৬, ১২ এবং ১৮ GMT (UTC)। (গ) মহাকাশ-নির্ভর পর্যবেক্ষণ (Space based Observation): ভূ-সমলয় (Geo-stationary) (কল্পনা, ইনস্যাট-৩এ, ইনস্যাট-৩ডি), ও মেরু পরিক্রমী উপগ্রহের মাধ্যমে একঘণ্টা/আধঘণ্টা ব্যবধানে তথ্য গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও বৈমানিকদের সাহায্য নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। (২) সেই আহরিত তথ্য মানচিত্রে আঁকা বা গাণিতিক প্রতিরূপে আরোপিত করা; (৩) আবহাওয়া কি জানার জন্য এবং বায়ুমণ্ডলের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে আবহাওয়ার স্বরূপ বোঝা; (৪) বিশ্লেষিত তথ্য থেকে আবহাওয়ার অবস্থা ব্যাখ্যা করা ও কারণ পর্যালোচনা করা; (৫) বায়ুমণ্ডলের ভবিষ্যৎ অবস্থা গণনা করা; (৬) এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আবহাওয়া কি হতে পারে সেটা নির্ধারণ করা।

স্বল্পমেয়াদী পূর্বাভাষের [SRF] পদ্ধতি:

সাধারণভাবে তিনটি পদ্ধতি SRF-এ ব্যবহার করা হয়। (১) রূপরেখা পদ্ধতি (Synoptic Method):এই পদ্ধতিতে যে জায়গার পূর্বাভাষ দিতে হবে, জায়গা এবং তার চারপাশে ভূপৃষ্ঠের ও উচ্চতর বায়ুস্তরের একই সময়ে সংগৃহীত বিভিন্ন আবহাওয়া তথ্যাবলী যত্নের সাথে বিশ্লেষণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে যিনি পূর্বাভাষ দিচ্ছেন তাঁর অভিজ্ঞতা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এবং আবহাওয়া পর্যবেক্ষণমূলক পূর্বজ্ঞান এই পূর্বাভাষের ভিত্তি তৈরি করে। যদিও প্রধানত ব্যক্তিনির্ভর তবু এটাই SRF-এর প্রধান পদ্ধতি (২) পরিসংখ্যান ভিত্তিক পদ্ধতি (Statistical Method) : SRF-এর কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। (৩) সংখ্যাত্মক আবহাওয়া পূর্বাভাষ (Numerical Weather Prediction [NWP]): এটিই সর্বাধুনিক পূর্বাভাষ পদ্ধতি। এটি একটি বাস্তবতা নির্ভর স্বল্পমেয়াদী পূর্বাভাষ পদ্ধতি। এর ভিত্তি সেই সব গতিবিদ্যা সম্বন্ধীয় সমীকরণ (Dynamical Equation) যেগুলি আবহাওয়ার সব জ্ঞাত প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক। অতি শক্তিধর যন্ত্রগণকে এই সমীকরণটাকে চালানো হয় এবং আবহাওয়ার বিভিন্ন চলরাশি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়। যিনি পূর্বাভাষ দিচ্ছেন, তিনি আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের যে ভবিষ্যদ্বাণী যন্ত্রগণক দিয়েছে সেগুলি কিভাবে পরস্পরের উপর ক্রিয়া করবে তা বিবেচনা করে সেই দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাষ তৈরি করেন।

(খ) **মধ্য মেয়াদী পূর্বভাষ (Medium Range Forecast[MRF])**: ৪ থেকে ১০ দিন সময়সীমার আবহাওয়ার পূর্বাভাষকে [MRF] বলা হয়। দেখা গেছে যে 'সংখ্যাত্মক' (Numerical) প্রণালী যেটি প্রচণ্ডভাবে গণনা নির্ভর সেটি মধ্য মেয়াদী সময়সীমার অত্যন্ত উপযোগী হাতিয়ার। তাই MRF-এর গণনায় আবহাওয়ার বিভিন্ন আদর্শ গাণিতিক অনুকৃতি (Model) ব্যবহার করা হয়। কৃষকদের আগাম আবহাওয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করানোই এই পূর্বাভাষের মূল উদ্দেশ্য, যাতে তারা

যথাযথভাবে ব্যবস্থা নিয়ে উৎপাদন বাড়াতে ও ক্ষতি কমাতে পারে। ১৯৮৮ সালে ভারতে, কৃষকদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই, 'জাতীয় মধ্য মেয়াদী আবহাওয়া পূর্বাভাষ কেন্দ্র' (National Centre for Medium Range Weather Forecast [NCMRWF]) স্থাপনা হয়েছে।

(গ) **দীর্ঘ মেয়াদী পূর্বাভাষ (Long Range Forecast [LRF])**

দশ দিনের বেশি আবহাওয়ার পূর্বাভাষকে দীর্ঘ মেয়াদী পূর্বাভাষ বলা হয়। সাধারণভাবে কিছু নির্দিষ্ট রাশি, যেমন বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা ইত্যাদির মাসিক/বছরের বিভিন্ন ঋতুর পূর্বাভাষ এই LRF-র বৈশিষ্ট্য। ভারতে, ভারতীয় আবহাওয়াবিদ্যা বিভাগের প্রথম প্রধান (তখন বলা হত 'প্রতিবেদনকারী' Reporter) স্যার এইচ এফ ব্লানফোর্ড, হিমালয় অঞ্চলের তুষারপাতের লক্ষণ বিচার করে, ১৮৮২-১৮৮৫ সাল পর্যন্ত দেশের মৌসুমী বায়ুর বর্ষার পরীক্ষামূলক পূর্বাভাষ দিয়েছিলেন। ৪ জুন, ১৮৮৬-র প্রথমটি থেকে শুরু করে নিয়মিত মৌসুমী বৃষ্টির পূর্বাভাষ দেওয়া শুরু হয়। বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক পাল্টানো ছাড়া এই পূর্বাভাষের এখন অব্দি কার্যত কিছু পরিবর্তন হয় নি। ১৯৮৮ সাল থেকে ভারতীয় আবহাওয়াবিদ্যা বিভাগ ১৬টি ধ্রুবকের ঘাত পুনরাবৃত্তি (16 parametre power regression) এবং স্থিতিমাপকের (parametric) অনুকৃতি প্রবর্তন করে, এর সাহায্য নিয়ে দেশের বিভিন্ন অংশে (চার সমপ্রকৃতি অঞ্চলে ভাগ করে) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর ফলে উৎপন্ন বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাষ দিতে নিয়মিতভাবে শুরু করে। বর্তমানে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বৃষ্টির পূর্বাভাষ দুই পর্যায়ে প্রকাশ করা হয়। প্রথম পর্যায় প্রকাশিত হয় এপ্রিলে, যেখানে দেশজুড়ে জুন থেকে সেপ্টেম্বরের সম্ভাব্য বৃষ্টিপাতের এক পূর্বাভাষ দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে, জুন মাসে সেই পূর্বাভাষকে পুনর্বিচার করে সময়োচিত করা হয়। ভারতের চার প্রধান ভৌগোলিক অঞ্চলে এবং সমগ্র ভারতের ঋতুকালীন বৃষ্টির পূর্বাভাষ বিশেষ করে জুলাই-এর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রকাশ করা হয়। এই পরিবর্ধিত এবং পরিমার্জিত পূর্বাভাষ সামগ্রিক পূর্বাভাষ পদ্ধতি (Ensemble forecast system) অনুকৃতি (model) নামে এক বিশেষ পদ্ধতিব্যবহার করে রচনা করা হয়।

৬। আবহাওয়া পূর্বাভাষের সমস্যা:

বায়ুমণ্ডল নিজেই, তার ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির সঠিক পূর্বাভাষের অন্তরায় কারণ তার বিশৃঙ্খল চরিত্র যাকে বলা হয় 'জাপানি প্রজাপতি প্রভাব' (Japanese butterfly effect) অস্বার্থঃ টোকিয়োতে যদি আজ কোনও প্রজাপতি পাখা নাড়ে, তবে কিছুদিন পর পৃথিবীর অন্য কোনও প্রান্তে ঝড় হতে পারে। কাজেই আবহাওয়ার পূর্বাভাষে অনিশ্চয়তা অল্পবিস্তর থাকবেই এবং ১০০ ভাগ সফলতা কখনই পাওয়া যাবে না।

কিছু অনিশ্চয়তার কারণ হল: বায়ুমণ্ডলের প্রারম্ভিক অবস্থা বর্ণনা করার অসুবিধা; এই অসুবিধা তৈরি হয় তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে এবং মানুষ ও যন্ত্রের আনুষঙ্গিক ভুলে। বায়ুমণ্ডলের প্রারম্ভিক অবস্থার নির্ভুল বর্ণনা তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা পৃথিবীর প্রতিটি বিন্দুর তথ্য সংগ্রহ করতে পারব, যেটা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তথ্যের জন্য নিরীক্ষণ কেন্দ্রের বিন্যাস উন্নততর করা গেলে ভুল হয়তো কিছু কম হবে, কিন্তু প্রাথমিক ক্ষেত্রে কিছু অমোচনীয় ভুল থাকার কারণে আমরা পুরো নির্ভুল হতে বোধ হয় পারব না।

এছাড়া প্রারম্ভিক পরিস্থিতিতে ভুল ছাড়াও, বায়ুমণ্ডলের গতিবিধি যে সমীকরণের সাহায্যে সূত্রবদ্ধ করা হয়, সেটাতেও কিছু ভুল থেকে যায়। বায়ুমণ্ডলের প্রক্রিয়াগুলো সরলরেখায় হয় না। তাছাড়া সব প্রাকৃতিক পদ্ধতিকে ভৌতভাবে অনুধাবন করা যায় না বা NWP অনুকৃতির (model) সাহায্যে রূপায়িত করা যায় না।

এমন কি বায়ুমণ্ডলের প্রারম্ভিক স্থিতি সম্বন্ধেও অনিশ্চয়তা সবসময়ই থাকে। সময়ের সাথে অনিশ্চয়তা বিশৃঙ্খলভাবে বাড়ে, প্রাথমিক অবস্থায় যোগ করা অনেক তথ্য মূল্যহীন হয়ে পড়ে। যেহেতু বায়ুমণ্ডলের প্রবাহ ত্রিমাত্রিক গঠনের উপর নির্ভরশীল, তাই অশ্চিয়তা বৃদ্ধির হারকে ঠিকমতো নির্ণয় করাও কঠিন।

৭। গ্রীষ্মমণ্ডলে পূর্বাভাষের বিশেষ সমস্যা:

(i) গ্রীষ্মমণ্ডলে আবহাওয়ার প্রণালী অন্যান্য অঞ্চলের আবহাওয়া থেকে আলাদা। যেমন, উচ্চ অক্ষাংশে আবহাওয়া অবস্থা প্রায় সমস্ত বছর ধরে পশ্চিম থেকে পূর্বে সবসময় গতিশীল। গ্রীষ্মমণ্ডলের আবহাওয়া কালকে সাধারণত নির্দিষ্ট ছক ধরে বর্ণনা করা যায়। প্রধানত দুটি ঋতু—বর্ষাকাল ও বৃষ্টিহীন

ও তার মাঝে মাঝে পরিবর্তনকালীন ঋতু —এইভাবেই গ্রীষ্মমণ্ডলের ঋতুচক্র।

(ii) গ্রীষ্মমণ্ডলে আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য এগুলির বিস্তার ও স্থায়িত্বের বিভিন্ন মাপ— বিশাল অঞ্চলব্যাপী বর্ষা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতর মাপের বজ্রবিদ্যুৎবাহী ঝড়। উপরন্তু এগুলো আবার পরস্পরের উদ্ভব, পুনরুত্থান ও মৃত্যুর প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলে।

(iii) তথ্যের স্বল্পতার কারণে আবহাওয়া তৈরির পদ্ধতি সবসময় নির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করা যায় না।

৯। আবহাওয়ার পূর্বাভাষ যাঁরা দেন তাঁদের কাজ মোটামুটি নিচের কয়েকটা শব্দে বলা যেতে পারে:তাঁকে নির্দিষ্ট সময়সীমা ও অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর কাছে অনেক তথ্য থাকবে, যার কিছু পরস্পর বিরোধী, বেশিরভাগই পূর্বাভাষের ক্ষেত্রে অল্পই কাজে আসবে এবং তাঁকে সঠিক তথ্যের খোঁজ করতে হবে, যেটা সাধারণভাবে তাঁর আয়ত্তে থাকবে না।

পূর্বাভাষ/সতর্কবার্তার প্রচার:

জনস্বার্থে দ্রুততম ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্বাভাষ এবং সতর্কবার্তার ব্যাপক প্রচার করা হয়, যথা—টেলিফোন, ফ্যাক্স, পুলিশি বেতারব্যবস্থা, আকাশবাণী, দূরদর্শন, বৈদ্যুতিন এবং ছাপা মাধ্যম। নিঃশুল্ক নম্বর ১৮০০১৮০১৭১৭-এ ফোন করেও আবহাওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া www.imd.gov.in [IMD (HQ)] এবং www.imdkolkata.gov.in [RMC Kolkata] ওয়েবসাইটে আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়।

পরিশিষ্ট —১

পূর্বাভাষের কিছু সাধারণ পরিভাষা:

নিম্নচাপ (Low pressure area [LOPAR]) ও সুস্পষ্ট নিম্নচাপ: বায়ুমণ্ডলের যে ক্ষেত্রে বায়ুর চাপ একই সমতলের পারিপার্শ্বিক ক্ষেত্র থেকে কম থাকবে। ভূমিতে বায়ুর গতি অনূর্দ্ধ ৩১ কি মি/ঘণ্টা।

গভীর নিম্নচাপ (Depression): ভূমিতে বায়ুর গতি এ সময়ে ৩১ থেকে ৪৯ কি মি/ঘণ্টা।

অতি গভীর নিম্নচাপ (Deep Depression): ভূমিতে বায়ুর গতি এই ক্ষেত্রে ৫০ থেকে ৬১ কি মি/ঘণ্টা।

ঘূর্ণিঝড় (Cyclonic storm):সমুদ্রে বায়ুর গতি এই ক্ষেত্রে ৬২ থেকে ৮৮ কি মি/ঘণ্টা।

তীব্র ঘূর্ণিঝড় (Severe Cyclonic storm): ভূমিতে বায়ুর গতি এই ক্ষেত্রে ৮৯ থেকে ১১৮ কি মি/ঘণ্টা।

অতি তীব্র ঘূর্ণিঝড় (Very Severe Cyclonic storm):ভূমিতে বায়ুর গতি এই ক্ষেত্রে ১১৯ থেকে ২২১ কি মি/ঘণ্টা।

সুপার সাইক্লোন (Super Cyclonic storm): ভূমিতে বায়ুর গতি এই ক্ষেত্রে >২২১ কি মি/ঘণ্টা।

ঘূর্ণাবর্ত (Cyclonic Circulation [Cycir]): যে কোনও নিম্নচাপ ক্ষেত্রে পরিমণ্ডলের উচ্চতলে বায়ুপ্রবাহ। উত্তর গোলার্ধে এই প্রবাহ ঘড়ির বিপরীত দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির দিকে।

বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত (Anticyclonic Circulation): যে কোনও উচ্চচাপ ক্ষেত্রে পরিমণ্ডলের উচ্চতলে বায়ুপ্রবাহ। উত্তর গোলার্ধে এই প্রবাহ ঘড়ির দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির বিপরীত দিকে।

পশ্চিমী ঝঞ্ঝা (Western Disturbance): নিম্নচাপ ক্ষেত্রে বা পরিমণ্ডলের উচ্চতলে ভূমধ্য সাগর, কাস্পিয়ান সাগর এবং কৃষ্ণসাগরে উৎপন্ন হয়ে পূর্বদিকে চালিত হয়ে উত্তর ভারতে পরিবাহিত হয়।

ট্রপোস্ফিয়ার (Troposphere): বায়ুমণ্ডলের সেই স্তর যেখানে আবহাওয়ার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ট্রপোস্ফিয়ারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল, উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে তাপমাত্রা কমে।

স্থানীয় পূর্বাভাষ (Local Forecast): আবহাওয়া কেন্দ্রের ৫০ কি মি ব্যাসার্ধের মধ্যে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ। দিনে চারবার পুনর্বিবেচনা করা হয়।

পরিশিষ্ট —২

বৃষ্টিপাতের বণ্টন বিবরণ	বণ্টন
দু'এক জায়গায়	অনূর্ধ ২৫% জায়গায় বৃষ্টিপাত
কয়েক জায়গায়	(২৬ থেকে ৫০) % জায়গায় বৃষ্টিপাত
অনেক জায়গায়	(৫১ থেকে ৭৫) % জায়গায় বৃষ্টিপাত
সব জায়গায়	(৭৬ থেকে ১০০) % জায়গায় বৃষ্টিপাত
	কোনও জায়গায় বৃষ্টি নেই

পরিশিষ্ট —৩

নামের বর্ণনা	বৃষ্টিপাত, মিমি-তে
বৃষ্টি হয় নি (No Rain)	০.০
অতি হাল্কা বৃষ্টি (Very light rain)	০.১ - ২.৪
হাল্কা বৃষ্টি (light rain)	২.৫ - ৭.৫
মাঝারি বৃষ্টি (Moderate rain)	৭.৬ - ৩৫.৫
স্বল্প ভারী বৃষ্টি (Rather Heavy rain)	৩৫.৬ - ৬৪.৪
ভারী বৃষ্টি (Heavy rain)	৬৪.৪ - ১২৪.৪
অতি ভারী বৃষ্টি (Very Heavy rain)	১২৪.৪ - ২৪৪.৪
অত্যন্ত ভারী বৃষ্টি (Extremely Heavy rain)	২৪৪.৫ বা তার বেশি।

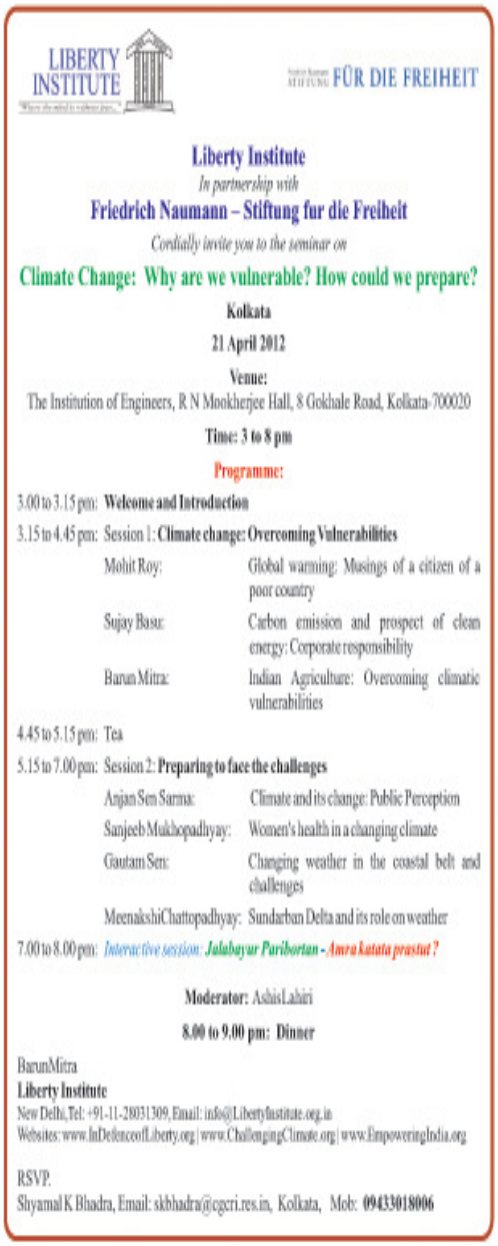

LIBERTY INSTITUTE

FÜR DIE FREIHEIT

Liberty Institute

In partnership with

Friedrich Naumann – Stiftung fur die Freiheit

Cordially invite you to the seminar on

Climate Change: Why are we vulnerable? How could we prepare?

Kolkata

21 April 2012

Venue:

The Institution of Engineers, R N Mookherjee Hall, 8 Gokhale Road, Kolkata-700020

Time: 3 to 8 pm

Programme:

3.00 to 3.15 pm: **Welcome and Introduction**

3.15 to 4.45 pm: Session 1: **Climate change: Overcoming Vulnerabilities**

Mohit Roy:	Global warming: Musings of a citizen of a poor country
Sujay Basu:	Carbon emission and prospect of clean energy: Corporate responsibility
Barun Mitra:	Indian Agriculture: Overcoming climatic vulnerabilities

4.45 to 5.15 pm: Tea

5.15 to 7.00 pm: Session 2: **Preparing to face the challenges**

Anjan Sen Sarma:	Climate and its change: Public Perception
Sanjeeb Mukhopadhyay:	Women's health in a changing climate
Gautam Sen:	Changing weather in the coastal belt and challenges
MeenakshiChattopadhyay:	Sundarban Delta and its role on weather

7.00 to 8.00 pm: *Interactive session: **Jalabayur Paribortan - Amra katata prastut?***

Moderator: AshisLahiri

8.00 to 9.00 pm: Dinner

BarunMitra
Liberty Institute
New Delhi, Tel: +91-11-28031309, Email: info@Libertyinstitute.org.in
Websites: www.InDefenceofLiberty.org | www.ChallengingClimate.org | www.EmpoweringIndia.org

RSVP.

Shyamal K Bhadra, Email: skbhadra@cgcri.res.in, Kolkata, Mob: **09433018006**

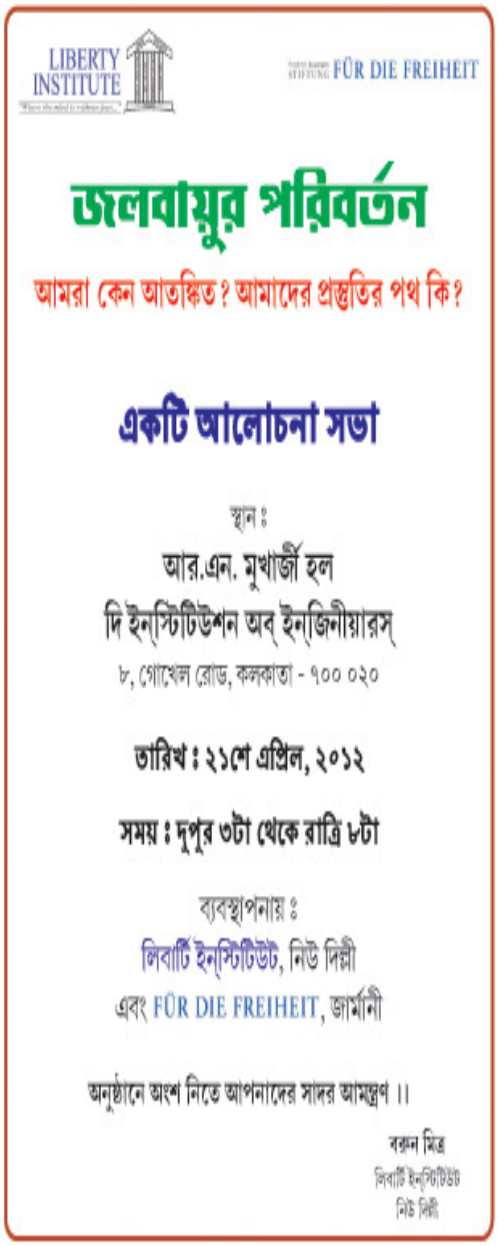

LIBERTY INSTITUTE

FÜR DIE FREIHEIT

জলবায়ুর পরিবর্তন

আমরা কেন আতঙ্কিত? আমাদের প্রস্তুতির পথ কি?

একটি আলোচনা সভা

স্থান ঃ

আর.এন. মুখার্জী হল

দি ইন্‌স্টিটিউশন অব্ ইন্‌জিনীয়ারস্

৮, গোখেল রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২০

তারিখ ঃ ২১শে এপ্রিল, ২০১২

সময় ঃ দুপুর ৩টা থেকে রাত্রি ৮টা

ব্যবস্থাপনায় ঃ

লিবার্টি ইন্‌স্টিটিউট, নিউ দিল্লী

এবং FÜR DIE FREIHEIT, জার্মানী

অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ ।।

বরুন মিত্র

লিবার্টি ইন্‌স্টিটিউট

নিউ দিল্লী